সুলতানী আমলে বাংলার নগরায়ন

গবেষক
সুফিয়া খাতুন
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মো. আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449663
Dhaka University Library
449663
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২০১০

চেয়ারম্যান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬৩৩০

নং.....

Chairman
Department of Islamic History & Culture
University of Dhaka
Dhaka 1000
Phone : 9661900-73/6330
E-mail : ishist_du@yahoo.com

তারিখ.....০৪-০৯-২০১০.....

প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এম. ফিল. গবেষক সুফিয়া খাতুনের "সুলতানী আমলে বাংলার নগরায়ন" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। আপেক্ষিক বিবেচনায় এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রী প্রাপ্তির লক্ষে এটি জমাদানের জন্য অনুমতি প্রদান করা গেল।

আমি তার সাফল্য কামনা করি।

(ড. মো. আখতারুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
তত্ত্বাবধায়ক
এম.ফিল./ পিএইচ.ডি.
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449663

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অবতরণিকা		iv
ভূমিকা :		১-১৩
প্রথম অধ্যায় :	প্রাক-মুসলিম বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও নগরায়ন	১৪-৪৪
দ্বিতীয় অধ্যায় :	বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও নগরায়ন প্রক্রিয়া	৪৫-৭৭
তৃতীয় অধ্যায় :	সুলতানী আমলে বাংলার নগর ও বন্দর	৭৮-১১০
চতুর্থ অধ্যায় :	সুলতানী বাংলার অর্থনীতি ও নগরায়ন	১১১-১৫৩
পঞ্চম অধ্যায় :	বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে নগরায়নের প্রভাব	১৫৪-১৯০
উপসংহার		১৯১-২০০
গ্রন্থপঞ্জি		২০১-২১৩
মানচিত্র		

449663

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

আমার এম.ফিল গবেষণার শিরোনাম "সুলতানী আমলে বাংলার নগরায়ন"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে উপর্যুক্ত শিরোনামে এম.ফিল গবেষণার জন্য ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে (রেজিঃনম্বর ৭৩) আমি নিবন্ধন লাভ করি। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান এর তত্ত্বাবধানে আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনা করি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রীক পরিকল্পনা ও বিন্যাস পদ্ধতি প্রণয়নে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান এর প্রাজ্ঞ-বিবেচনা, সততা, নিষ্ঠা, অবিরত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। তত্ত্বাবধায়কের অনাবিল আন্তরিকতা সুচিন্তিত মতামত অকৃত্রিম ভালোবাসা আমার গবেষণাকর্মকে অনেক সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর স্নেহে ধন্য।

ঋণ স্বীকার গবেষকদের অন্যতম কর্তব্য। এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম, ড. আয়শা বেগম, ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, ড. আবদুল বাছির, জনাব আতাউর রহমান বিশ্বাস, জনাব ছিদ্দিকুর রহমান খান, মিসেস নুসরাত ফাতেমা, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেইন ভূঁইয়া, জনাব এস এম মফিজুর রহমান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও জনাব এ.কে.এম শাহনাওয়াজ নানাবিধ তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। আমি উপরোক্ত শিক্ষকবৃন্দের নিকট বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

আমি আরো যাদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করছি তারা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাবৃন্দ, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বাংলাদেশ পাবলিক লাইব্রেরীর কর্মকর্তাবৃন্দ। পরিশেষে যে সব লেখকদের রচনা ও রচনাংশ আমি এ গবেষণা কর্মে ব্যবহার করেছি তাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সুফিয়া খাতুন

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলার নগরায়নের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। নানা কারণে বাংলায় নগরের গোড়াপত্তন ঘটেছিল। বাংলার সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করলে তৎকালীন সময়ের নগরায়নের ধারণা পাওয়া যায়। প্রাক-মুসলিম আমলের নগর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কারণ, ঐ সময় ইমারতসহ নগরের সংখ্যা খুব কম ছিল। 'বিজয় ক্যাম্প' অনেক ক্ষেত্রে নগরের কাজ করত এবং এ বিজয় ক্যাম্পসমূহে স্থায়ী ইমারত খুব কম সংখ্যায় নির্মিত হতো। তাই আমরা তৎকালীন সময়ের পুন্ড্রনগর, ময়নামতী বা পাহাড়পুর ছাড়া উল্লেখযোগ্য নগরের সন্ধান পাই না। গৌড়ের নাম অতি প্রাচীনকাল থেকে উচ্চারিত হলেও তা যে একটি উন্নত নগর ছিল এ বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।[১] তবে গৌড় যে নগর ছিল না এটাও জোর দিয়ে বলা যায় না। এছাড়া সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ যে তাম্রলিপ্তি বন্দরের বর্ণনা দিয়েছেন, অষ্টম শতক থেকে সেই বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মূলত অষ্টম শতক থেকে বাংলায় অর্থনৈতিক বিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে নগরের পত্তন বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং পূর্বের নগরকেন্দ্রগুলোর উন্নতি ও সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যায়। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পর নগরায়নের এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়।

বাংলার ভৌগোলিক পরিচিতি

বর্তমান গবেষণায় আমরা 'বাংলাদেশ' ও 'ভারতের' পশ্চিমবঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত ভূ-খন্ডকে 'বাংলা' নামে অভিহিত করেছি। মুসলিম শাসনের শুরুতেই প্রথম 'বাংলা' নামের ব্যবহার দেখা যায়। ফার্সি উচ্চারণে 'বাঙ্গালা'কে

Dhaka University Institutional Repository

পর্তুগিজরা 'বেঙ্গলা' বলে অভিহিত করেছে। অবশ্য মুসলমানদের 'বাঙ্গালা' শব্দ ব্যবহারের অনেক আগেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর দু'জন বিদেশী পর্যটক মার্কোপোলো ও রশিদউদ্দিন তাদের ভ্রমণ কাহিনীতে 'বংগাল' নামটি ব্যবহার করেছিলেন। 'বঙ্গ' ও 'বাঙ্গালা' শব্দের ব্যবহার হিন্দু আমলেও প্রচলিত ছিল যা সংস্কৃত সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। তবে সে সময় এই 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গালা' বাংলার একটি সীমিত অঞ্চলকে বোঝাত। ইউরোপীয়দের ভাষায় তা রূপান্তরিত হয়ে 'বেঙ্গল' নামে পরিচিতি পায়। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলীম উল্লেখ করেন যে, বাঙ্গালার লোকেরা জল-প্লাবনের গতিরোধের জন্য 'আল' বেঁধে বাস করত। এজন্যই সে দেশ 'বাঙ্গ+আল'=বাঙ্গাল নামে পরিচিত। কালক্রমে তা বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়।[২]

দ্বাদশ শতকের শেষভাগেও 'বাঙ্গালাহ' নামটি কেবলমাত্র বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক মিনহাজ উল্লেখ করেন যে, "তার লখনৌতি (মুসলিম আমলে) ভ্রমণকাল পর্যন্ত (১২৪২-১২৪৪) লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ তখনও 'বঙ্গে' তাদের শাসন বজায় রেখেছিলেন।"[৩] তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, "লখনৌতি ও বিহারের বিভিন্ন অংশে এবং বঙ্গ ও কামরূপ দেশের লোকেরা ইবনে বখতিয়ার খলজির ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল।"[৪] এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, লখনৌতি অঞ্চল থেকে বঙ্গ অঞ্চল ভিন্ন ছিল এবং লখনৌতি যেমন বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চল ছিল, তেমনি বঙ্গ অঞ্চল ও কামরূপ অঞ্চল পাশাপাশি ছিল।

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী প্রথম মুসলিম লেখক যিনি 'বাঙ্গালাহ' নাম ব্যবহার করেছিলেন। তিনি সুলতান বলবনের উক্তি উল্লেখ করে বলেন, "আমি লখনৌতি-এর 'বাঙ্গালা' অঞ্চল আমার কণিষ্ঠ পুত্রকে (বুগরা খানকে) অর্পণ করেছি। এদেশ কিছুকাল যাবৎ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।" বারানী সুলতান বলবনের উক্তি উল্লেখ করে আরো বলেন যে, 'ইকলিম-ই-লক্ষ্মণাবতী'

Dhaka University Institutional Repository

ও 'আরসা-ই-বাঙ্গালাহ' বশে আনতে আমাকে কি বিরাট রক্তপাতই না করতে হয়েছে।[৫] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুলতান বলবনের সময় লখনৌতি থেকে 'বাঙ্গালাহ' একটি সম্পূর্ণ আলাদা অঞ্চল ছিল। পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজ তাঁর কবিতার পংক্তিতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহকে (১৩৯০-১৪১০ খ্রিস্টাব্দ) বাঙ্গালার সুলতানরূপে অভিহিত করেছিলেন।[৬] পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকের চৈনিক বর্ণনায় সমগ্র দেশটাকে 'পাং-কো-লা' রূপে অভিহিত করা হয়েছে।[৭]

বিষয়বস্তু

সুলতানী বাংলার নগরায়ন ও নগরকেন্দ্র বিকাশের ইতিহাস আলোচ্য গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। বিদ্যমান তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে মুসলমানদের আগমনের পর বাংলায় নগরকেন্দ্রের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা সূচিত হয়েছিল। মূলত গজনভী ও সেলজুক শাসনের অবক্ষয়ের পর মধ্যএশিয়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দেয়। এছাড়া তুর্কিরা দলে দলে দেশত্যাগ করে ভারতে আগমন করে যা ভারতীয় উপমহাদেশের পরবর্তীকালের ইতিহাসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। এছাড়া তৎকালীন সময়ে ঘোর ও খাওয়ারিজমের শাসকবৃন্দ গোটা রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সামের রাজত্ব আফগানিস্থানের গজনি থেকে বরেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতে তারই রাজ-প্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন আইবেকের অধীনস্ত কর্মচারী ছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি। তিনি উচ্চাভিলাষী ও দুঃসাহসিক সেনাপতি ছিলেন। মগধ ও বরেন্দ্রে তার কার্যকলাপ থেকে দেখা যায় যে, সামরিক পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক পুনঃগঠনের ব্যাপারে এ খলজি নেতার যথেষ্ঠ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল। তিনি পর্যায়ক্রমে বাংলা জয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে তিনি বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন এবং নদীয়ার দিকে অগ্রসর হন।

ইবনে বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে[৮] রাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে বাংলার রাজধানী নদীয়া জয় করেন এবং নদীয়ায় অবস্থান না করে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে লক্ষণাবতীতে (হিন্দু আমলের) রাজধানী স্থাপন করেন।[৯] তিনিই প্রথম বাংলায় মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম শাসনামলে মূলত স্বাধীন সুলতানদের বিচক্ষণতার জন্য বাংলায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। ফলে তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০] বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নগরায়নের বিপ্লব শুরু হয়েছিল।

বাংলার সালতানাত প্রসারণের সাথে সাথে কিছু প্রশাসনিক এলাকা গড়ে উঠেছিল। সময়ের সাথে সাথে এগুলো জনবহুল নগরীতে পরিণত হয় যেমন- সাতগাঁ, সোনারগাঁ ও পান্ডুয়া। তদুপরি সুফি-সাধকদের বসতি স্থাপন ছিল নগরায়নের অন্যতম নিয়ামক। এসব দরবেশরা বিভিন্ন উপশহর কিংবা ধর্মীয় সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু-বৌদ্ধ স্থানগুলোর কাছাকাছি তাদের খানকাহ স্থাপন করেছিলেন যা পরবর্তীতে মসজিদ ও মাদ্রাসায় উন্নীত হয়। মুসলিম শাসকগণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল জয় করছিলেন এবং তার স্মৃতিস্বরূপ টাকশাল স্থাপন করেন। যেমন, লখনৌতি, সাতগাঁও, মুয়াজ্জেমাবাদ, শহর-ই-নও, শরীফাবাদ ও রোটাস্‌পুর।[১১] সুলতানগণ এসব টাকশাল থেকে বিজয়চিহ্ন হিসেবে ধাতব মুদ্রার প্রচলন করেন। এসব মুদ্রা শুধু সার্বভৌমত্বের প্রতীকই ছিল না বরং তা বাংলার বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের আগমনের পর বাংলার নগরকেন্দ্রগুলোর পুনরুজ্জীবন ঘটে কিন্তু ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে গড়ে ওঠা বাংলার অধিকাংশ নগরকেন্দ্রগুলো ছিল ছোট যেমন, গৌড়। এসব নগরগুলো আঞ্চলিক সরকারের দ্বারা ব্যবহৃত হতো এবং পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি অভিজাত মহলের সাথে সম্পর্কিত ছোট আকারের বাণিজ্যিক কাজ চালাত। উল্লেখ্য যে গঙ্গার প্লাবনের ফলে গৌড় নগর গ্রামে পরিণত হয়। কিন্তু ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে গৌড় মুসলমানদের রাজধানী করায় আস্তে আস্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । এভাবেই দেবকোট, সোনারগাঁ ও পান্ডুয়া প্রধান শহরে পরিণত হয়েছিল। মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে ও স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলায় নগরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার কারণ হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন। এ সময়ে বাংলায় বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং ইসলাম ধর্মের প্রসারের ফলে বহির্বিশ্বের সাথে বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়। এতে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হয় অন্যদিকে তেমনি বিদেশী বিজেতাদের নগরে বাস করার স্বাভাবিক প্রবণতা ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার প্রয়োগে নগরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মূলত সুলতানী বাংলার নগর বিকাশের স্বরূপ ও গতি প্রকৃতি নির্ণয় করা এ গবেষণার উদ্দেশ্য। বিষয়টি কষ্টসাধ্য ব্যাপার হলেও, সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থ, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে তৎকালীন বাংলার নগর বিকাশের ইতিহাস নির্মাণ সম্ভব।

গবেষণার কালপরিধি

গবেষণা কর্মটিতে সুলতানী আমল বলতে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ (প্রাক-মুঘল যুগ) পর্যন্ত বোঝানো হয়েছে। এ সময়টিকে গবেষণাকর্মে অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হলো প্রথমত: এ সময় বাংলায় তুর্কো -আফগান নতুন শাসক শ্রেণীর আগমনে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। সুলতানগণ বাংলায় টাকশাল নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং কড়ির পরিবর্তে ধাতব মুদ্রার প্রচলন করেন ফলে বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের ফলে বাংলায় শিল্পকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিম সমাজ গঠন, সামাজিক গতিশীলতা, মুসলিম-অমুসলিম মিথস্ক্রিয়ার ফলে সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও নগর বিপ্লবের ছাপ পড়ে। কিন্তু যতদূর সম্ভব সমসাময়িক বিভিন্ন ধরণের তথ্য উপাত্তের অনুপস্থিতির জন্য সুলতানী আমলের নগরায়ন ও তার প্রভাব বিষয়টি এখন পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে আলোচিত হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ সুলতানী আমল ছিল বাংলার সবচেয়ে গঠনমূলক যুগ। এ সময় বাংলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন, সামাজিক গতিশীলতা ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ।

তৃতীয়তঃ সুলতানী আমলের শেষের দিকে মুসলিম শাসন দুর্বল হয়ে পড়ায় শেরশাহ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা জয় করেন ফলে বাংলায় আফগান শাসন সূচিত হয়।

গবেষণার উৎস উপাত্ত পর্যালোচনা

সমসাময়িককালে লিখিত গ্রন্থের মধ্যে মিনহাজ উস সিরাজের *তবকাত-ই-নাসিরী* একটি মৌলিক উৎস। মিনহাজ তার গ্রন্থে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। মালিক তুঘরল তুগান খান যখন লখনৌতির গভর্নর ছিলেন (১২৩৩-১২৪৪ খ্রিস্টাব্দ) তখন মিনহাজ লখনৌতিতে আগমন করেন। বাংলায় অবস্থানের সময় তিনি

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে বখতিয়ার খলজির সৈনিক মুতামিদ-উদ-দৌলার নিকট থেকে মুসলমানদের বাংলা বিজয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি মুসলমানদের বাংলা বিজয় এবং মামলুক শাসনের কিছু অংশ তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া তিনি দিল্লীর আমীরদের সম্বন্ধে আলোচনার সময় লখনৌতিতে নিযুক্ত গভনর্রদের কার্যকলাপ আলোকপাত করেছেন।

জিয়াউদ্দিন বারানীর *তারিখ-ই-ফীরূজশাহী* ও সুলতান ফীরূজশাহ তুঘলক বিরচিত *ফুতূহাত-ই-ফীরূজশাহী* বাংলার ইতিহাসের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ। বারানী তার গ্রন্থে গিয়াসউদ্দীন বলবনের সিংহাসনে আরোহন (১২৬৬ খ্রিস্টাব্দ) থেকে সুলতান ফীরূজ শাহ তুঘলকের রাজত্বের প্রথম ছয় বছর (১৩৫১-১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দ) সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি আটজন শাসকের জীবন ও কীর্তি বর্ণনা করেন। অন্যদিকে সুলতান ফীরূজশাহ তুঘলকের গ্রন্থের নামের অর্থ ফীরূজশাহের বিজয়সমূহ হলেও উক্ত গ্রন্থে সামরিক বিজয় বা যুদ্ধ বিগ্রহের ইঙ্গিতবহ তথ্য দেয়ার মাঝে মাঝে সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রন্থটির অর্থ দাঁড়ায় 'নৈতিক বিজয়' বা কৃতিত্বের কাহিনী। *ফুতুহাত্-ই ফীরূজশাহী*তে সুলতান তার জ্ঞান বিশ্বাস মতে তার মানব কল্যাণমূলক কাজের এবং আদেশ নির্দেশের বিবরণ দিয়েছেন। সুলতানের নির্মিত ফীরূজাবাদ নামক রাজধানী শহরের প্রাসাদের গায়ে সম্পূর্ণ প্রন্থটি খোদাই করা হয়।

গোলাম হোসেন সলীম-এর *রিয়াজুস সালাতীন* বাংলার ইতিহাসের অন্যতম মৌলিক উৎস। উক্ত গ্রন্থে তিনি ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম বাংলার ইতিহাস রচনা করেছেন। সমসাময়িক কালের ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে এটিই একমাত্র গ্রন্থ যেখানে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা, জলবায়ু, উৎপন্ন কৃষি, ও শিল্প দ্রব্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়।

বাংলার ইতিহাস রচনায় আবুল ফজলের *আকবর নামা* ও *আইন-ই-আকবরী* অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আবুল ফজল *আইন-ই-আকবরী*তে আকবরের প্রবর্তিত আইনসমূহ, প্রচলিত মুদ্রা, জমি মাপার রীতি, ওজন পদ্ধতি, রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও উক্ত গ্রন্থে প্রাক-মুঘল যুগের বাংলায় রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তৎকালীন সময়ের ইউরোপীয় ও চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। কারণ তারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য এদেশে এসেছিলেন বলে দেশের সামগ্রিক চিত্র বর্ণনা করেছেন। যেমন, মরককোর পর্যটক ইবনে বতুতা তাঁর *সফরনামায়* (রোজনামচা/ ডায়েরী) বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে বাংলাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী ও সম্পদের ভান্ডার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনা থেকেও বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

বাংলার সুলতানগণ কর্তৃক উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপি ও মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। যদিও এগুলো আরবি ও ফার্সি ভাষায় লিখিত তথাপি মুদ্রা ও শিলালিপি সংক্রান্ত অনূদিত গ্রন্থগুলো থেকে সুলতানের নাম, সময়কাল ও বিভিন্ন স্থাপত্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মূলত এসব গ্রন্থাবলীর মধ্যে Abdul Karim-এর *Corpus of the Muslim Coins of Bengal* এবং Ahmed Hasan Dani-এর *Muslim Architecture in Bengal* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলার ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙালার ইতিহাস* (আদিপর্ব)। তিনি তার গ্রন্থে বাংলার সমাজ ও জনগোষ্ঠীর ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সেখানে উপেক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও K.M. Ashraf-এর *Life and Conditions of the People of Hindustan* , Muhammad Mohar Ali-*History of the Muslim of Bengal* এবং Muhammad Abdur Rahim-এর *Social and Cultural History of Bengal* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মমতাজুর রহমান তরফদারের *Husain Shahi Bengal (A Socio-Political Study)*, Richard M Eaton's-এর *The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1204-1760)* এ বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা পাওয়া যায়।

এ যাবৎ সমগ্র মুসলিম ভারতের নগরায়নের উপর স্বল্প পরিসরে কিছু কাজ করা হলেও বাংলার নগরায়নের উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। সমগ্র মুসলিম ভারতের উপর যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে হামিদা খাতুন নাকভীর *"Urban Centres and Industries in Upper India,1556-1803 (1968)"* এবং *"Urbanization and Urban Centres under the Great Mughals, 1556-1707(1972)"*, এ মুঘল আমলের নগরায়ন ও নগরকেন্দ্রগুলোর উত্থান ও পতন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অনিরুদ্ধ রায়ের "মধ্যযুগের ভারতীয় শহর (১৯৯৯)" গ্রন্থে নগরায়ন নয় বরং নির্ধারিত কিছু নগরকেন্দ্র সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্প্রতি মো. আখতারুজ্জামান-এর সমগ্র মুসলিম বাংলার উপর *Society and Urbanization in Medieval Bengal (2009)* শিরোনামে গবেষণা কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এ গবেষণা কর্মে তিনি মধ্যযুগের বাংলার নগরায়ন ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত গবেষণা কর্মে তৎকালীন বাংলার ত্রয়োদশ ও চর্তুদশ শতকের অর্থনীতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও

সংস্কৃতিতে নগরায়নের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করলেও সমগ্র সালতানাত যুগের নগরায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়নি।

এজন্যই আমি "সুলতানী আমলে বাংলার নগরায়ন" বিষয়টি গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছি। এ গবেষণা কর্মে মূলত সুলতানী আমলে বাংলার নগরায়ন প্রক্রিয়া, বিভিন্ন নগরের কর্মকান্ড এবং বাংলার অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতিতে এর প্রভাব বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার গঠন পরিকল্পনা

গবেষণা কর্মটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে প্রাক-মুসলিম বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। রাজনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে বাংলার ভূ-রাজনৈতিক বিভাগগুলো যেমন-বঙ্গ, সমতট, বরেন্দ্র ও রাঢ় এর অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় হিন্দুদের (ব্রাহ্মণদের) অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও নীচু শ্রেণীর হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বৈষম্য প্রতিফলিত হয়েছে। তৎকালীন সময়ে বাংলায় একান্ত কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। এ সময়ে একক মানসম্পন্ন কোন মুদ্রা ব্যবস্থা না থাকায় নগরায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়। মূলত সপ্তম শতকে বাংলায় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও সেনামলে তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়, ফলে কড়িই ছিল একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম। মুদ্রার উপস্থিতি না থাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে বাণিজ্যিক পথগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে ফলে নগরগুলো তাদের পুরানো ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নগর ও বন্দরগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পরিণত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও নগর বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকে ইবনে বখতিয়ার খলজির আগমনের ফলে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। মূলত মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে বাংলায় নগরায়নের বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। সালতানাতের প্রসারণের সাথে সাথে কিছু প্রশাসনিক এলাকা গড়ে উঠেছিল যা পরবর্তীতে প্রসিদ্ধ নগরীতে পরিণত হয় যেমন, সাতগাঁ, সোনারগাঁ ও পান্ডুয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান শাসকদের সাথে বাংলায় সুফি-সাধকদেরও আগমন ঘটেছিল এবং তাঁদের খানকাহ্‌কে ঘিরে নগরায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তাছাড়া সুলতানগণ বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনিক সদর দপ্তর, পুলিশ ক্যাম্প, দুর্গ, গ্যারিসন, নির্মাণ করেন। শাসকগণ বাংলার রাজধানী পরিবর্তন ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে টাকশাল স্থাপন করেন এবং সে সব টাকশাল থেকে ধাতব মুদ্রার প্রচলন করেন। এ উন্নত প্রযুক্তি ছিল নগরায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সুলতানী আমলে বাংলার নগর ও বন্দরসমূহের উত্থান ও বিকাশ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বাংলার প্রধান প্রধান নগরগুলোর মধ্যে নদীয়া, লখনৌতি, দেবকোট, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁ, সাতগাঁ ও পান্ডুয়া ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সব নগরের ইতিহাস এবং নগর ও বন্দরে পরিচালিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ও বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার নগরায়নের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলার সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় নগরায়নের ফলে একক মানসম্পন্ন মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সুলতানগণ কর্তৃক মুদ্রা প্রচলনের ফলে

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এছাড়া নতুন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রপ্তানি বাণিজ্যও বৃদ্ধি পায়। ফলে বাংলা অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে। মূলত মুদ্রার প্রচলন ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ও বাণিজ্য বিস্তারের মাধ্যমে তৎকালীন বাংলা গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির পাশাপাশি মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করে।

সুলতানী আমলে নগরায়নের ফলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে প্রভাব পড়েছিল সে সকল বিষয় সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। মুসলিম বাংলার সমাজ গঠন, সামাজিক স্তর বিন্যাস, সামাজিক গতিশীলতা বা বিবর্তন ও বিভিন্ন পেশার পরিবর্তনে নগরায়নের প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। মুসলিম শাসকশ্রেণী ও উলামাভক্ত সুফিগণের উদার ও উচ্চতর আদর্শসমূহ হিন্দু সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে হিন্দু বর্ণপ্রথাপীড়িত সামাজিক জীবনে সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের প্রথাগত একচেটিয়া প্রভাবের বিপরীতে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা তাদের মানবিক মর্যাদা ফিরে পায় এবং শিক্ষার অধিকার লাভ করে। মুসলিম শাসকদের সহনশীল মনোভাবের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের কতিপয় সমন্বিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি গড়ে উঠে। মুসলিম সংস্কৃতি তথা মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষা, খাদ্যদ্রব্য ও অলংকারাদির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া গবেষণাকর্মটির উপসংহার বিভিন্ন অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সমন্বয়ে লিখিত হয়েছে । সবশেষে রয়েছে আকর ও সহায়ক গ্রন্থের তালিকা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. আশিয়ারা খাতুন, "সুলতানী আমলে বাংলার নগর, প্রকৃতি ও প্রকারভেদ", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ত্রিশবর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৪০৩, পৃ. ২৫

২. গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতীন*, শ্রীরাম প্রাণগুপ্ত সম্পাদিত, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৭

৩. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, অনুবাদ ও সম্পাদনা, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৫-৬১

৪. ঐ

৫. জিয়াউদ্দীন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৫৩

৬. গোলাম হোসেন সলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫-১০৬

৭. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম*, অনুবাদ মো: রেজাউল করিম, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯৯-১১২

৮. Ahmad Hasan Dani, *Bibliography of the Muslim Inscription of Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1957, p. 133-147; Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, (1204-1760),* London, 1994, p. 23; আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, সুলতানী আমল, ঢাকা, ১৯৯৯,পৃ. ৮৮

৯. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, ৬৭; J.N. Sarkar, *History of Bengal*, vol.II, pp. 4-8, *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* vol. xx1v-v1, 1979-81 AD, pp. 1-10

১০. Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, 2009, p. 372

প্রথম অধ্যায়

প্রাক-মুসলিম বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও নগরায়ন

১. প্রাক-মুসলিম বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটা বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। মুসলিম বাংলার নগরায়ন ও সামগ্রিক আর্থ সামাজিক অবস্থা বুঝার জন্য প্রাক-মুসলিম বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক।

১.১ রাজনৈতিক অবস্থা

মুসলমানদের আগমনের পূর্বে তথা হিন্দু যুগে সমগ্র বাংলার কোন একটি বিশেষ নাম ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন উত্তরবঙ্গে পুন্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল প্রভৃতি।[১] এছাড়াও উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কতকাংশ গৌড় নামে সুপরিচিত ছিল। এই সমুদয় অঞ্চল মুসলমান যুগেই সর্বপ্রথম একত্রে 'বাঙ্গালা' বা পরবর্তীকালে 'বাংলা' নামে পরিচিত হয়।[২] এছাড়াও গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল অর্থাৎ বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চলকে বলা হত বরেন্দ্র। যার অপর নাম ছিল পুন্ড্রবর্ধন। প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির আয়তন বিভিন্ন সময়ে কমেছে ও বেড়েছে। সমগ্র প্রাক-মুসলিম যুগে পুন্ড্রবর্ধন রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বহন করেছে। সমতট-হরিকেল গঠিত হয়েছিল কুমিল্লা, নোয়াখালি ও সিলেট নিয়ে। সমতট ও শ্রীহট্টকে (সিলেটকে) বলা হত মণ্ডল। আর প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে এ অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। উপরোক্ত এলাকাগুলোর মধ্যে বিশেষ করে, বঙ্গ,

Dhaka University Institutional Repository

বরেন্দ্র প্রভৃতি পরিচিত হয়েছিল ভৌগোলিক এলাকারূপে। যদিও এই ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক এলাকাগুলোর সীমা নির্দেশ করা কঠিন। "Region and Sub-Region in Pre-Muslim Bengal" শীর্ষক প্রবন্ধে Barrie M.Morrison- এর তথ্য বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার দেখিয়েছেন যে, প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলার মোট চারটি প্রধান ভূ-রাজনৈতিক বিভাগের অস্তিত্ব ছিল । যথা:

- গঙ্গার উত্তর দিকের অঞ্চল এবং যমুনার পূর্বে ও মহানন্দার পশ্চিমে অবস্থিত ভূ-খন্ডের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিল বরেন্দ্র ।
- ভাগীরথী হুগলী নদীর উভয় তীরের এলাকাব্যাপী অর্থাৎ বর্তমান কালের চব্বিশ পরগনাও মেদিনীপুর নিয়ে গড়ে উঠেছিল রাঢ় নামের আরেকটি প্রশাসনিক অঞ্চল ।
- সুরমা ও মেঘনার পূর্বে অবস্থিত সিলেট (শ্রীহট্ট), কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম ছিল সমতটের অন্তর্ভুক্ত।
- মেঘনা, পদ্মার সংযোগস্থলে ছিল বঙ্গ নামের অন্য একটি জনপদ। অথার্ৎ বর্তমানের ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল বঙ্গ।[৩]

ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বাংলার ভূ-রাজনৈতিক সীমানার বর্ণনা দিতে গিয়ে কানিংহাম উল্লেখ করেন যে, বাংলা চারটি জেলায় (রাজ্যে) বিভক্ত ছিল যথা: (ক) গঙ্গার উত্তরে ছিল বরেন্দ্র (বারিন্দ) ও বঙ্গ (বঙ্) এবং দক্ষিণে ছিল রাঢ় (রাধা, রাল) ও বাগ্দি। আর প্রথম দু'টোকে ব্রহ্মপুত্র নদী এবং দ্বিতীয় দু'টোকে (রাঢ় ও বাগ্দি) গঙ্গার জালিঙ্গি শাখা পৃথক করে রেখেছিল। ব্লকম্যান বলেন যে, ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের পূর্বে বাংলা পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো :

Dhaka University Institutional Repository

- হুগলির পশ্চিমে এবং গঙ্গার দক্ষিণে রাধা (রাঢ়, রাল)
- গঙ্গার ব-দ্বীপ বাগ্‌দি
- বাগ্‌দির পূর্বে বঙ্গ (বাঙ্)
- পদ্মার উত্তরে এবং মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী বরেন্দ্র (বারিন্দ) এবং
- মহানন্দার পশ্চিমে মিথিলা।[৪] সমসাময়িক পারসিক উৎসগুলোতে উৎকীর্ণ লিপিতে (epigraphic) গৌড় (গৌড়া), বঙ্গ, সমতট (সংকত), পাতিকেরা প্রভৃতি ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের কথা উল্লেখ রয়েছে।

তেরো শতক পর্যন্ত বাংলা কতকগুলো অংশে বিভক্ত ছিল। তখন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থিত বঙ্গ বা বাঙালার অন্তর্ভুক্ত ছিল বিক্রমপুর, সিলেট এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল।[৫] বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জনপদের বর্ণনায় ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, একাদশ শতকের শেষ দিকে বঙ্গকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। একটি উত্তরাঞ্চল ও আরেকটি দক্ষিণাঞ্চল । উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা এবং সমুদ্রতীরবর্তী খাল-নালা সমাকীর্ণ আর দক্ষিণাঞ্চল ছিল অনুত্তর বঙ্গ। সেন বংশের শাসক কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের আমলে বঙ্গের দু'টি বিভাগ ছিল; একটি বিক্রমপুরভাগ এবং অন্যটি নাব্যমন্ডল। বর্তমান বিক্রমপুর পরগনা ও সেই সঙ্গে ইদিলপুর পরগনার কিছুটা নিয়ে ছিল বিক্রমপুরভাগ। বাখরগঞ্জ জেলা এবং আরও পূর্বদিকের সমুদ্র পর্যন্ত গোটা অঞ্চল নিয়ে ছিল নাব্যমন্ডল।[৬]

বর্তমান ত্রিপুরারাজ্য দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সমতটেরই অংশ ছিল । এক সময় সমতটের পশ্চিম সীমা চব্বিশ পরগনা (খাড়ি পরগনার) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গা ভাগীরথীর পূর্ববর্তী সীমা থেকে আরম্ভ করে মেঘনা-মোহনার সমুদ্রশায়ী ভূ-খন্ডকেই বলা হত সমতট ।[৭]

পুন্ড্র জনপদ ষষ্ঠ শতকে পুন্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয়েছে এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি প্রধান ভুক্তিতে পরিণত হয়। পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি বগুড়া, দিনাজপুর এবং রাজশাহী জেলা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। মূলত রাজমহল এবং গঙ্গা ভাগীরথী থেকে আরম্ভ করে করতোয়া পর্যন্ত গোটা উত্তরবঙ্গই বোধহয় পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেনামলে পুন্ড্রবর্ধনের দক্ষিণসীমা একদিকে বর্তমানের চব্বিশ পরগনার খাড়ি পরগনা এবং অন্যদিকে ঢাকা, বাখরগঞ্জের সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুন্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী ছিল বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা এবং সম্ভবত পাবনা জেলার বুক জুড়ে।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে নবম ও দশম শতক থেকে রাঢ় জনপদের দুটি বিভাগ লক্ষ্য করা যায় যথা: দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ় (প্রাচীন নাম ছিল বজ্রভুমি ও সূক্ষ্মভূমি)। গঙ্গা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী দক্ষিণ ভূ খন্ড বর্তমান হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমানের দক্ষিণাংশ দক্ষিণ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। অন্যদিকে বর্তমানের মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা নিয়ে উত্তর রাঢ় গঠিত ছিল। মূলত রাঢ় দেশের দুটি রাষ্ট্রবিভাগ ছিল: বর্ধমানভুক্তি ও কঙ্কগ্রামভুক্তি। বর্ধমানভুক্তির আবার তিনটি বিভাগ ছিল; উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ় ও পশ্চিমে খাটিকা । পাল ও সেন আমলে দন্ডভুক্তিমন্ডল অথার্ৎ দাঁতন পর্যন্ত বর্ধমানভুক্তির সীমা বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম–খাটিকা গঙ্গার পশ্চিম তীরের বর্তমান হাওড়া জেলা। বর্তমান মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলার অধিকাংশ এবং সাঁওতাল পরগনারও কিছুটা কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ শতকে বঙ্গাল নামে একটি পৃথক জনপদ ছিল । দক্ষিণ রাঢ়ের পরই ছিল বঙ্গাল দেশ। এই দুই দেশের মাঝখানের সীমানা ছিল গঙ্গা-ভাগীরথী। সেই সময় বঙ্গাল দেশ বলতে প্রায় সমস্ত পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতটশায়ী সমস্ত ভূ-খন্ডকেই বোঝাত।[৯] মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদাহ ও বর্ধমান নিয়ে গৌড় জনপদ গঠিত ছিল । গৌড়ের রাষ্ট্রসীমা কখনও কখনও উৎকল দন্ডভুক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গৌড় বলতে কখনও কখনও সমগ্র বাংলাকেও বুঝানো হত। পাল রাজারা পশ্চিম বঙ্গের শাসক হলেও নিজেদেরকে গৌড়েশ্বর বলে পরিচয় দিতেন।[১০] গৌড় ও নদীয়ায় সেন রাজগণের রাজধানী ছিল। বল্লালচরিতে উল্লেখ রয়েছে যে, বল্লাল সেনের সময় তিনটি রাজধানী ছিল- গৌড়, বিক্রমপুর ও স্বর্ণগ্রাম।[১১]

মূলত প্রাক্-মুসলিম যুগে কোন একভাষিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না এবং এই অঞ্চলের লোকজনের মধ্যে কোন আঞ্চলিক সংহতি-চেতনাও ছিল না। তাছাড়া প্রশাসনিক ইউনিটগুলোর মধ্যকার বিচ্ছিন্নতা তখন প্রকট ছিল।[১২] রাষ্ট্র ও সমাজ বিভিন্ন স্তর, উপস্তরে বিভক্ত ছিল। পালরাজাদের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল গুপ্ত আমলের শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। পাল আমলে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গুপ্ত আমলের মতো ভুক্তি, বিষয়, মন্ডল প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রিয় রাষ্ট্রের বৃহত্তর রাজ্য-বিভাগের নাম ছিল ভুক্তি: প্রত্যেক ভুক্তি কয়েকটি বিষয়ে, প্রত্যেকটি বিষয় কয়েকটি মন্ডলে, প্রত্যেকটি মন্ডল কয়েকটি বীথীতে, প্রত্যেক বীথী কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামই ছিল সর্বনিম্ন ইউনিট।[১৩] সেন শাসনামলে বঙ্গদেশের পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি ও দন্ডভুক্তি ছাড়াও কঙ্কগ্রামভুক্তি নামে আরেকটি ভুক্তির নাম পাওয়া যায়।[১৪] রাষ্ট্রের এরূপ বিভক্তির ফলে বৃহত্তর শক্তির পরিবর্তে আঞ্চলিক রাজশক্তির

Dhaka University Institutional Repository

উত্থান ঘটে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ও রাজবংশ দুর্বল থাকায় দেশের ভেতর ও বাহিরের সামন্তচক্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেন আমলে দেশের সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি ব্রাহ্মণরা নিয়ন্ত্রণ করত। তাই অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় দূর্দশাগ্রস্ত বণিকরাও রাজপৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। এক্ষেত্রে বরং সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু বণিকতন্ত্রের দ্বন্দ্বই ছিল স্বাভাবিক। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বর্ণনা পাওয়া যায় বল্লালচরিতে। উক্ত চরিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, বল্লাল সেন সুবর্ণ বণিকদের এবং নিম্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদেরকে শুদ্রের স্তরে নামিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে 'পতিত' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তার ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী কৈবর্তগণ জলচল শূদ্রের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন এবং মালাকার, কুম্ভকার কর্মকার ও সৎশূদ্রের সমাজে স্থান পেয়েছিলেন। স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিকরা ব্রাহ্মণের অভিশাপে সমাজে পতীত হয়ে অসৎ শূদ্রের পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল।[১৫] এছাড়া জেলে, নর্তক, ডোম প্রভৃতি পেশাজীবীরা ছিল অজলচল শূদ্র। শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি এ যুগের রাষ্ট্রে ও সমাজ ব্যবস্থায় তেমন ছিলনা। কর্মচারীদের তালিকায় দেখা যায় ভূমি ও কৃষি সংক্রান্ত রাজপদই বেশী। বর্ণ-ব্রাহ্মণ্য সমাজের বণিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের স্থান তেমন উঁচুতে ছিল না। ফলে এই যুগের কৃষি ও ভূমি নির্ভরতা ক্রমেই বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রাজপাদোপজীবী, মহত্তর, কুটুম্বের দল সবাই ছিল ভূমিনির্ভর। যেখানে জমিই জীবিকার প্রধান উপায় এবং জমির উপর যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত, সেখানে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠাই স্বাভাবিক।[১৬] রাজশক্তির দুর্বলতা ও দেশের অভ্যন্তরে এরূপ দ্বন্দ্ব-কলহ বহির্বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল। ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও চরম অবক্ষয় এবং নগর কেন্দ্রগুলোর ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ অর্থনৈতিক অবস্থা

গুপ্তযুগের প্রথম সার্বভৌম নরপতি শশাঙ্কের শাসনামলে (৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা আঞ্চলিকতার গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে একটি বলিষ্ঠ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। পরবর্তীতে পালদের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে।[১৭] কিন্তু সেনামলে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়ে। অবশ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পর ব্যবসায়-বাণিজ্য ও নগরকেন্দ্রগুলোর ক্ষয়িষ্ণুতার ভিতর দিয়ে এই পরিবর্তনের লক্ষণগুলো প্রকাশ পাচ্ছিল। ফলে বাংলার বহু অঞ্চলে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির (Money economy) স্থানে পণ্য বিনিময়ের রীতি (Natural economy) প্রাধান্য পেয়েছিল।[১৮] বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার মূল বিষয় ছিল ৩টি: যথা কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসায়- বাণিজ্য । নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

গ্রাম বাংলার প্রাণ। আর এ জন্যই বাংলা চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। মহাকবি কালিদাস বাংলার ধান চাষের প্রণালী সম্বন্ধে একটি উক্তি করেছিলেন, "তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করার পর তাঁহারা শালিধান্যের ন্যায় (রোয়া ধান) বিজেতা রঘূর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিপুল ধনরাশির দ্বারা তাহাকে পুঁজা করিলেন।"[১৯] কবি তার উপমার মধ্য দিয়ে ধান চাষের বিশিষ্ট পদ্ধতির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ধানের চারাগাছ যেমন করে একবার উপড়ে ফেলে আবার রোয়া হয় তেমনি করে রঘু বঙ্গজনদের একবার উৎখাত করে আবার প্রতিরোপিত করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে বাংলার অত্যাচারি শাসকগণ প্রজাদের উপর ব্যাপক অত্যাচার ও নির্যাতন চালাত।

Dhaka University Institutional Repository

ধানের চাষ ছাড়াও ইক্ষুর চাষ হতো। ইক্ষুর রস হইতে প্রচুর পরিমানে চিনি ও গুড় প্রস্তুত হতো। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত'এ দেখা যায়, বরেন্দ্রীয় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল সেখানকার আখের ক্ষেত। বরেন্দ্রীর প্রাচীনতম ও বৃহত্তম সংজ্ঞা হচ্ছে পুন্ড্র।[২০] তাছাড়া 'গৌড়' নাম "গুড়" থেকে এসেছে।[২১] এছাড়াও কর্ণসুবর্ণ রাষ্ট্রের একটি গ্রামের তাম্রলিপিতে 'সর্ষপ-যানক' তথাপি পাওয়া যায়, যার অর্থ সর্ষে ক্ষেতের পাশ বরাবর রাস্তা। এ থেকে জানা যায়, বাংলার গ্রামে সর্ষের চাষ ছিল। অনেক রকম ফলমুল জন্মাত। মহুয়া জন্মাত উত্তর বঙ্গে, যার দ্বারা মদ তৈরী হত। বরেন্দ্র ভূমিতে এলাচের চাষ হতো। এছাড়াও লঙ্কা, লবঙ্গ, তেজপাতা, লাক্ষা ও তুলার চাষ হত। ফলবান বৃক্ষের মধ্যে নারিকেল, সুপারি, আম, কাঠাল, ডালিম, কলা, লেবু ও ডুমুর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরূপ ভূমি ও কৃষি নির্ভরতার ফলে গ্রাম্য জীবন সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে বাঁধা পড়েছিল। রোজকার জীবনে যা প্রয়োজনীয় তা গ্রামের মধ্যেই পাওয়া যেত; যার জন্যেই বাইরে যাওয়ার দরকার হতো না। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মানের উন্নতি হয়নি। অর্থাৎ বাংলার অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি। এ দেশের কৃষির মত শিল্পও অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ ছিল। হস্ত ও কারুশিল্প বাংলার মানুষের জীবনে একটি অতি প্রয়োজনীয় বুনিয়াদ হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। এসব শিল্পগুলো মূলত কোন গ্রাম কিংবা শহরকে ঘিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা নির্ভর করত ঐ গ্রাম বা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। এসব শিল্পের শ্রমিকরা উক্ত গ্রাম বা শহরকে ঘিরে তাদের আবাসস্থল গড়ে তুলত আর এভাবেই ক্ষুদ্র পরিসরকে ঘিরে গ্রামের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধারণত এসব শিল্প ও বাণিজ্য নির্দিষ্ট কিছু পরিবার এবং এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। এসব শিল্পের মধ্যে ছিল পোশাক শিল্প, চিনি শিল্প, লবণ শিল্প ও মৃৎ শিল্প।[২২] খ্রিস্টের জন্মের আগ থেকেই বস্ত্রশিল্পের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

এদেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এখানকার কার্পাসজাত বস্ত্রাদি ভারতের সর্বত্র এবং বহির্বিশ্বেও সমাদৃত হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাংলার কার্পাস বস্ত্রাদির প্রশংসা করা হয়েছে। বাংলার যে মসলিন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ছিল তার উদ্ভব অতি প্রাচীন কালেই হয়েছিল। গুটিপোকার চাষ, কার্পাসের চাষ ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল বাংলার অর্থ আগমনের প্রধান উপায়।[২৩] বাংলায় চার রকমের বস্ত্রশিল্প ছিল-দুকূল, পর্ত্রোন, ক্ষোম ও কার্পাসিক। নবম শতাব্দীর আরব বণিক সুলায়মান উল্লেখ করেন যে, রুহমী দেশে (বাংলায়) এমন সূক্ষ্ম এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয় যাহা অন্য কোন দেশ প্রস্তুত করতে পারে না। ইহা দ্বারা প্রস্তুত পোশাক একটি অঙ্গুরীয়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করানো যায়। তিনি স্বচক্ষেই ইহা দেখেছেন বলে উল্লেখ করেন।[২৪] বিলাসিতার উপকরণ যোগাবার জন্য স্বর্ণকার, মনিকার প্রভৃতি শিল্পও বিদ্যমান ছিল। কর্মকার, মালাকার, সূত্রধর প্রভৃতি সম্প্রদায় গৃহ, নৌকা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নির্মাণ করত এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা উপকরণ যোগাত। এ দেশের বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী ক্রমশ বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তন্তুরায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, কংসকার, শঙ্খকার, মালাকার প্রভৃতি শিল্পী সংঘ ছিল। পরে তারা ক্রমে সমাজে এক একটি স্থান অধিকার করে এক একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটেছিল। বাংলায় বহু নদ-নদী থাকায় শিল্পজাত দ্রব্যাদি দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণের যথেষ্ঠ সুবিধা ছিল। ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানে হাট ও গঞ্জ এবং নতুন নতুন নগর গড়ে উঠেছিল। তৎকালীন শহর বা নগরগুলো বাজারকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এবং বাজারগুলো 'চক' (Chauk) নামে পরিচিত ছিল।[২৫]

প্রাক-মুসলিম বাংলায় ক্ষুদ্র পরিসরে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। দেশের অভ্যন্তরে স্থলপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য হত। তবে স্থলপথের তুলনায় নৌপথেই

Dhaka University Institutional Repository

বেশী ব্যবসায়-বাণিজ্য হত।[২৬] পণ্ডিতগণের মতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যে পরিবহন ব্যবস্থা ও বাজার প্রক্রিয়া ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশমাত্র। তৎকালীন বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারসমূহ হাটস্ (Hattas) নামে পরিচিত ছিল। হাটগুলো সাধারণত সপ্তাহান্তে বা দুসপ্তাহে একবার গ্রামের বিস্তৃত এলাকায় বসত, এসব হাটস্-এ গ্রাম্য কৃষক, শ্রমিক ও পুঁজিপতিরা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করত। এসব বাজারগুলো সাধারণত নদীর তীর কিংবা সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুকূল স্থানে গড়ে উঠত। গ্রাম্য বাজার ছাড়াও শহরকেন্দ্রিক কিছু দোকানপাট ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তৎকালীন বাংলার শহর, নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো স্থলপথের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করত।[২৭] বাংলায় শুধু যে দেশের ভেতরে ব্যবসায়-বাণিজ্য হত তা নয়, বিদেশের বাজারেও জিনিসপত্র রপ্তানি করা হত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় বাঙ্গালী বণিকেরা দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূল ধরে গুজরাট পর্যন্ত যে সব বাণিজ্য সম্পদ নিয়ে যেতেন তার মধ্যে ছিল পান, সুপারি ও নারিকেল। সুপারির বদলে মাণিক্য, পানের বদলে মরকত এবং নারকেলের বদলে তারা শঙ্খ আনতেন।[২৮] গঙ্গা নদীর মোহনায় 'গাঁঙ্গে' নামক বন্দর ছিল। 'গাঁঙ্গে' নামক বন্দর থেকে বণিকেরা জাহাজ ছেড়ে হয় সমুদ্রের উপকূল ধরে দক্ষিণ ভারত ও লঙ্কাদ্বীপে যেত অথবা সোজাসুজি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সূবর্ণভূমি অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, জাভাদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে যেত। এছাড়া সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়, মুক্তা, লবণ ও গাছ-পাকড়া এদেশ হতে চালান যেত।[২৯] পাল, সেনসহ অন্যান্য রাজবংশের সময়ও ঘোড়া ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[৩০] চন্দ্র বংশের পতনের পর দুর্বল সেন রাজাদের অধীনে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের প্রক্রিয়ার আবর্তে পড়ে গিয়েছিল এবং এই অবস্থায় ভূমিদানের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম প্রায় অপরিহার্য ছিল; এছাড়া কৃষি ও

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প উৎপাদন এবং বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো ভূমিকেও সহজে বিপর্যস্ত করেছিল। এছাড়া এ সময়ে ধলেশ্বরী ও মেঘনার গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যায়। ফলে নদীপথে পণ্য দ্রব্যাদি আদান প্রদানের গতিবিধিতে মারাত্মক রকমের বাঁধা সৃষ্টি করে, যা বাংলার অর্থনীতির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। তাছাড়া মেঘনা নদীর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন তখন আর সম্ভবপর ছিল না। যে সামুদ্রিক বাণিজ্যই ছিল এ অঞ্চলের সমৃদ্ধির মূল কারণ, নগরকেন্দ্রগুলো সেই বাণিজ্যই হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে বণিক ও কারিগর শ্রেণী অন্যান্য পেশাদার শ্রেণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং নগরকেন্দ্রগুলোর বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ লোপ পায় অর্থাৎ এই সময়ে নগরকেন্দ্রগুলোর বাণিজ্যিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল।[৩১]

অষ্টম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা যখন ব্যবসায়-বাণিজ্য চলছিল তখন উত্তর-পশ্চিম বাংলায় নগরকেন্দ্রগুলো তাদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। তাম্রলিপ্তি ও গঙ্গাবন্দর নৌ চলাচলের জন্য তখন আর উপযুক্ত ছিল না; তার ফলে এ বন্দরগুলো থেকে যে বাণিজ্য পথগুলো বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছিল তাদের বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তা হারায়। বিদেশী বণিকদেরকে আকর্ষণ করার মতো কোন পণ্যদ্রব্য ঐ সব বাণিজ্যকেন্দ্রে উৎপন্ন হতো না। আঞ্চলিক বাণিজ্যে ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়েছিল, ফলে বণিক ও কারিগর শ্রেণী কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করেছিল।[৩২] বাংলার এরূপ বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার বর্ণনা করেন যে, সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিক পরিমাণে ভূমি দান করা হয়েছিল; সেই ভূমির সীমার ভেতরে অবস্থিত যে সব লোকজনের কাছে থেকে তারা সেবা লাভ করতঃ তারা হচ্ছে মালাকার, তৈলিক,

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকার, চর্মকার, নাপিত, বৈদ্য এবং আরো অনেকেই। প্রদত্ত ভূমিই ছিল করমুক্ত যাতে করে জমির গ্রহীতা ঐ জমি থেকে যথেষ্ট আয় করতে পারত। তৎকালীন সময়ের শিলালিপিগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতে 'পীড়ম' বা বাধ্যতামূলক শ্রমের উল্লেখ রয়েছে। শিলালিপিগুলো থেকে কতকগুলো সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণী বাদ দিলেও দেখা যায় যে, সমাজ ছিল কৃষিনির্ভর।[৩৩] রাজাদের সম্পদ এবং সম্পত্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি তাদের মনোভাব বোধহয় তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। পাল ও সেন রাজাদের তাম্রশাসনগুলোতে ভূমির পরিমাপের যে নির্দিষ্ট বিবরণ আছে তাতে মনে হয় যে, ঘন লোকবসতি সম্পন্ন কৃষি অঞ্চলে ভূমি হস্তান্তর করা হয়েছিল। এ ঘটনার ফলে শিল্প উৎপাদন নগরকেন্দ্র এবং মুদ্রা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে খুব সম্ভব অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল এবং তাতে করে এদেশের সমাজের অর্থনীতির বুনিয়াদ বিষমভাবে বদলে দিয়েছিল।[৩৪]

প্রাক্ মুসলিম যুগে (পাল ও সেনামলে) ব্যবসায় বাণিজ্যের অবক্ষয়ের কারনে টাকা-পয়সার হিসেবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য সম্ভবতঃ কোন মানসম্পন্ন মুদ্রা প্রচলনের প্রয়োজন ছিল না। দেশে বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল অনুপস্থিত। এ জন্যই পণ্য বিনিময় প্রথা অথবা কড়ির মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য স্বাভাবিকভাবে চালু হয়েছিল। সপ্তম শতক থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় মুদ্রার প্রচলন কমে এসেছিল এবং সেন আমলে মুদ্রা প্রচলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; কেননা সেন যুগের কোন মুদ্রাই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কড়ির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চলত। সেন আমলে মুদ্রা হিসাবে কড়ির প্রচলন ছিল। মিনহাজ-ই-সিরাজ তার *তবকাত-ই-নাসিরী* গ্রন্থে বলেন যে, "দানশীল শাসক লক্ষ্মণ সেন কাহাকেও লক্ষকোড়ির কম দান করতেন না।"[৩৫] ধারণা করা হয় যে, এ যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিশেষ করে সামুদ্রিক বাণিজ্য ভাটা

Dhaka University Institutional Repository

পড়েছিল।[৩৬] এ সময়ে সমাজ পুরোপুরি কৃষি নির্ভর হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় উপকূলের সাথে পশ্চিমের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কিত যোগসূত্রের বিলোপ সাধনের কারণে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবনতি ঘটে এবং নগর কেন্দ্রগুলোর অবক্ষয় দেখা দেয়।[৩৭]

১.৩ সামাজিক অবস্থা

মুসলিম শাসনের পূর্বে মূলত আর্য ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতি বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর্য সমাজের জাতিভেদ প্রথা বাংলায় প্রচলিত ছিল এবং সামাজে বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ বিভাগে কাজ করতো। বৈদ্যরা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতো এবং দাসজাতীয় ব্যক্তিরা রাজকর্মচারী ও সভাকবি ছিলো।[৩৮] পালযুগে সমাজে বর্ণভেদ প্রথার তীব্রতা ছিলো না । কারণ পালরা উচ্চ বংশজাত ছিলেন না। সমাজের শীর্ষে অবস্থান করতেন ব্রাহ্মণেরা,[৩৯] আর করণ-কায়স্থরা বিশেষ প্রাধান্য ভোগ করতো। বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ায় বৈশ্যদের প্রভাব কমে যায়। কৈবর্ত্যরা বেশ প্রভাবশালী ছিল। সমাজের নিম্নস্তরে ছিল চন্ডাল, শবর, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়।

সেন আমলে সমাজে জাতিভেদ প্রথা পুরোপুরি বলবৎ ছিল। ব্রাহ্মণেরা ছিল সমাজের নেতা। তাদেরকে দেবতাতূল্য মনে করত নীচু শ্রেণীর লোকেরা। তারা বৌদ্ধদের প্রতি উদার ছিল না, সেনামলে হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।[৪০] রক্ষণশীল সেনগণ নিজেদের প্রভাব সৃষ্টিতে প্রত্যয়ী হলেও পালযুগের নিজস্ব ঐতিহ্যে গড়ে উঠা সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে নিজেদের বিযুক্ত রাখে। পাশাপাশি তারা পুরনো অবস্থার পরিবর্তন এনে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়। মূলত,

Dhaka University Institutional Repository

সেনামলে ধর্মীয় অবকাঠামোর পরিবর্তন আসে। কট্টর ব্রাহ্মণ হিন্দুদের দ্বারাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ফলে সংখ্যার দিক দিয়ে ছোট অংশ হলেও ব্রাহ্মণদের প্রতাপ চূড়ান্তে পৌঁছে। ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও নিচু বর্ণের হিন্দুদের উপর তা অত্যাচার হয়ে দেখা দেয়। বল্লাল সেনের সময় কৌলিণ্য প্রথা বংশগত ছিলনা। লক্ষ্মণসেনের সময় তা বংশগত মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। ফলে তার বিষময় প্রতিক্রিয়া পড়ে সমাজে। অকুলীন সাধারণ মানুষ সামাজিকভাবে নিগৃহীত হতে থাকে। এ সময়ে তাই সাধারণ মানুষের চোখে প্রশাসনিক শাস্তির চেয়ে বেশি ভয়ংকর হয়ে ওঠে সামাজিক শাস্তি। শুধু সামাজিক ক্ষেত্রে নয় ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই সাধারণ জনগোষ্ঠীর অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। মূলত বাংলায় আর্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিচারে চতুর্বর্ণের বিকাশ ঘটে। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে এই চার রর্ণ ছিলো ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্র। পেশাগত দিক বিবেচনায় আরও অনেক জাত-পাতের বিভক্তি সমাজে দেখা যায়।[৪১]

মুসলিম আগমনের পূর্বে শাস্ত্রজ্ঞান চর্চায়ও ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল। আর সে কারণেই যে কোন প্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রেই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। সেনামলে নিম্নশ্রেণীর কোন সদস্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি। পরবর্তীতে বিকশিত মুসলিম সমাজের পাশাপাশি হিন্দু সমাজের যে অস্তিত্ব ছিল সেখানেও এই রক্ষণশীলতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আর এ জন্যই শ্রী চৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৮খ্রিস্টাব্দ) যখন শাস্ত্রচর্চায় সাধারণ শ্রেণীর অধিকারকে স্বীকার করে নেন তখন তার মতবাদ প্রচারে ব্রাহ্মণরা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। সমাজ পরিবর্তন ও রাজ আনুকূল্যের কারণে সাধারণ হিন্দু সমাজ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনে অবদান রাখতে পারেনি। সাধারণ শ্রেণীর হিন্দুরা ব্রাহ্মণদের সংস্কৃতিচর্চা

Dhaka University Institutional Repository

করার সুযোগ পেত না। তাদের (সাধারণ শ্রেণীর হিন্দুদের) ধর্মাচরণের অধিকার ছিলো না, সমাজেও তারা কোন রকম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। ব্রাহ্মণরা সাধারণ শ্রেণীকে শুধু সামাজিক বিধান আরোপ করেই কোণঠাসা করে রাখেনি বরং তারা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমেও তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলো। এ উৎপাতের মাত্রা এত অধিক ছিল যে, ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছানুসারে তাদের কড়ি কেড়ে নিতো, এমনকি তাদের হত্যা করলেও ব্রাহ্মণদের কোন দন্ড ভোগ করতে হতো না।[৪২] এছাড়া সেন রাজাদর্শও গণমানুষকে শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিলো। যেমন, লক্ষ্মণ সেনের সময় তার স্বৈরাচারী চিত্র ফুটে উঠে শেখ শুভদয়ার কাহিনীতে। উক্ত কাহিনীতে অত্যাচারের মাত্রা এত বেশি ছিলো যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজসভার অমার্ত্যরা ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো।[৪৩]

সেন আমলে কোন রাষ্ট্রীয় আদর্শ গড়ে উঠেনি। স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্তৃত্বের মনোভাব সমানভাবে চলেছে। সমাজ ক্রমশঃ ভূমিনির্ভর ও কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংকীর্ণ। রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব বেড়ে গিয়েছিল বলে রাষ্ট্র নামক যন্ত্রে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা আসর জমিয়ে বসেছিল। শিল্পী, বণিক ব্যবসায়িরা এই সময়ে সমাজের নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল। এই যুগে প্রতিনিধিত্বশীল ব্রাহ্মণদের প্রধান চেষ্টাই ছিলো তাদের সংস্কৃতিকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়া। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য থাকায় সমাজে শ্রেণী বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছিল এবং রাজায় ও প্রজায় আর্থিক ও সামাজিক অসঙ্গতি বিরাজমান ছিল। ফলে একদিকে আর্থিক বৈষম্য আর অন্যদিকে উচ্চকূলে জন্ম বলে একদল লোকের প্রাধান্য এ দু'টি কারণে গড়ে উঠেছিল মানুষে মানুষে এক বিরাট স্তরভেদ।[৪৪] মূলত সেন রাজত্বকালে উত্তর ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের দাপটে সাধারণ বাঙালীর মধ্যে নৈরাজ্য দেখা

Dhaka University Institutional Repository

দেয়। ইতোমধ্যে প্রায় ২০ বছর রাজত্ব করে বৃদ্ধ রাজা (লক্ষ্মণসেন) বাবার মত গঙ্গাতীরে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে যান। তার এ শেষ বয়সে রাজ্যে অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সূচনা হয়। ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে একটি তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে ডোম্মনপাল নামে এক ব্যক্তি সুন্দরবনের খাড়ী পরগনায় বিদ্রোহী হয়ে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে।[৪৫] এছাড়া মেঘনার পূর্ববর্তী আর-একটি স্বাধীন রাজবংশ (দেববংশ) গড়ে ওঠে। পুরুষোত্তম দেবের পুত্র মধুসূদন দেব ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় প্রথম স্বতন্ত্র রাজা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার পুত্র বাসু দেব; বাসু দেবের পুত্র দামোদরদেব ত্রিপুরা-নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। রাষ্ট্রের ভেতর যখন এ ভাঙন চলছে, সে সময়ে পশ্চিম থেকে মুসলিম রাজশক্তি আস্তে আস্তে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছিল। কুতুবউদ্দিন আইবেক তখন দিল্লির মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উত্তর ভারতের হিন্দু রাজ্যগুলো একে একে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে; সমাজে রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃঙ্খলার বালাই নেই, এ সুযোগে ভাগ্যান্বেষণকারী ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বিহারে ও বাংলায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আসেন। তিনি বিহার, গৌড় ও বরেন্দ্র জয় করেন। বর্তমান চুনারের কাছে ভুইলি গ্রামে ছিল ইবনে বখতিয়ার খলজির জায়গিরের সদর ঘাঁটি। গাহড়বাল সামন্তরাজাদের হারিয়ে তিনি সে সব জায়গা লুটপাট ও দখল করতে শুরু করেন। সেখানে হিন্দু রাজাদের মোটেই দাপট ছিল না।[৪৬] এর দুই বছর পর তিনি বিহার জয় করেন। বিহার জয়ের পরের বছর এক দল সৈন্য নিয়ে গয়া ও ঝাড়খন্ডের ভিতর দিয়ে নদীয়ার দিকে অগ্রসর হন। নদীয়ার (নবদ্বীপের) রাজপ্রাসাদে ইবনে বখতিয়ার খলজি অতর্কিতে ঢুকে পড়ায় লক্ষ্মণসেন খালিপায়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান।[৪৭] লক্ষ্মণসেনের রাজপ্রাসাদ ও নগর অধিকার করার পর ইবনে বখতিয়ার খলজি কয়েক দিন ধরে নদীয়া বিধ্বস্ত করে গৌড় বা লক্ষণাবতীতে (হিন্দু আমলের) গিয়ে নিজের শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[৪৮] এরূপ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক প্রাধান্য হারিয়ে বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতি যখন দুর্দশাগ্রস্থ এবং সেনযুগের ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে সাধারণ হিন্দু সমাজ বিপর্যস্থ ঠিক সেই সময়ে মুসলিম সমাজের ভিত্তি গড়ে ওঠে। তৎকালীন দুর্বল ও পঙ্গু রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থা মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করে তুলেছিলো। পরবর্তীতে মুসলমান সুলতানদের সুশাসনে নগরায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ায় বাংলায় গড়ে ওঠে সমাজ ও সংস্কৃতির একটি নতুন রূপরেখা।

২. নগরায়ন এবং প্রাক-মুসলিম বাংলার নগর ও বন্দর

নগরায়ন শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Urbanization যা ল্যাটিন শব্দ 'Urbs' (আরব্‌স) হতে এসেছে। 'Urbs' (আরব্‌স) বলতে রোমানরা রোমের নগরকে বুঝিয়েছেন। সাধারণ অর্থে নগরায়ন বলতে নগরের উদ্ভব, বিকাশ ও বৃদ্ধিকে বুঝায়।[৪৯] বুৎপত্তিগত অর্থে যেখানে পর্বত শ্রেণীর ন্যায় সৌধসমূহ বিদ্যমান তাকে নগর বলে। B.D.Chattopadhyaya-এর মতে, যে কোন কালের বিচারে নগরায়নের সংজ্ঞা শাস্ত্রভেদে বিভিন্ন।[৫০] স্থাপত্যবিদ্যার গ্রন্থাদিতে একটি 'নিগম' বা 'শহর' তা-ই, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বসতি এবং প্রচুর কারিগর আছে। 'নিগমে'র অর্থ বাজার-এলাকা বা একটি সংঘ, অর্থাৎ বণিকদের একটি সংঘবদ্ধ দল। [৫১] এগার শতকের বৈয়াকরণ কৈয়টের মতে, নগর হলো উঁচু পাঁচিল এবং পরিখা দিয়ে ঘেরা বাসভূমি। এখানে কারিগর ও ব্যবসায়ী সংঘের তৈরি আইন ও নিয়ম-কানুন বলবৎ থাকত।[৫২] কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রে দুর্গকে নগর বলা হয়েছে।[৫৩]

আধুনিক গবেষকগণ নগরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। গর্ডন চাইল্ডের মতে বিভিন্ন সৌধ, ঘনবসতিপূর্ণ বিস্তীর্ণ এলাকা, খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন শ্রেণী (শাসক, বণিক, কারিগর) এবং শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চা

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি নগর-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য।[৫৪] অ্যাডাম্‌সের মতে নগরায়নের জন্য জনসংখ্যা ও ঘনত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এবং নগর-সভ্যতার প্রথম ধাপে স্বতন্ত্র কারিগরি-বিদ্যার গুরুত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।[৫৫] অমলানন্দ ঘোষের মতে, একটি শহর গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত শাসন-বিভাগীয় সংগঠন এবং বণিক গোষ্ঠীর বিকাশ।[৫৬] আর.এস.শর্মার মতে, শুধু আয়তন ও জনসংখ্যার পরিমাণ নয়, বস্তুগত জীবনমান এবং পেশার বৈচিত্র্য শহরের অত্যাবশ্যক উপাদান। যদিও শহরের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কৃষিজাত পণ্য সামগ্রী/দ্রব্যাদি উদ্বৃত্ত অত্যাবশ্যক, তবু কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন যে-কোনো বাসস্থানই নগর নয়। কারিগরি বিদ্যা-কেন্দ্র এবং অর্থভিত্তিক বিনিময়-প্রথাও নগর-জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।[৫৭] দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর মতে কেবল বাণিজ্যই নগর-বিকাশের একক-নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মধ্য-এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে উপমহাদেশের স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। নগরায়নের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।[৫৮] তবে বিভিন্ন নগর অভিন্ন কারণে নয়, বিভিন্ন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিকশিত হয়েছে। কোথাও মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে কৃষি, কোথাও ব্যবসায়-বাণিজ্য, কোথাও নিহিত ছিল অন্য কোনো কারণ, কোথাও হয়তো শিক্ষা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে নগর-বিকাশকে অনিবার্য করে তুলেছে।[৫৯]

নগর এর সংজ্ঞায় The New Encyclopedia of Britanica (দা নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটেনিকা)-তে বলা হয়েছে যে, নগর হল, "a relatively permanent and highly organized centre of population of greater size or importance than a town or village"[৬০] এই নগর থেকেই নগরায়ন শব্দটি ব্যবহৃত বা প্রচলিত। নগরায়নের সংজ্ঞায় গবেষক ভরদ্বাজ বলেছেন, নগরায়ন হচ্ছে গ্রামীণ এলাকা

Dhaka University Institutional Repository

থেকে নগর এলাকায় মানুষের আগমন এবং এর ফলে গ্রামীন এলাকা অপেক্ষা নগর এলাকায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়া।[৬১] এছাড়াও বলা যায় যে নগর একটি প্রক্রিয়া যার ফলে মূলত কৃষিনির্ভর গ্রামীন জীবনব্যবস্থা থেকে মানুষের শিল্প ও বাণিজ্যভিত্তিক শহরের জীবন ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটে। আর অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রক্রিয়া কাজ করে আসছে।

নগরায়ন এর সংজ্ঞায় Wikipedia তে বলা হয়েছে (Mestrius Plutarchus বলেছেন), "Urbanization is the physical growth of urban areas from rural areas as a result of population immigration to an existing urban area. Effects include change in density and administration services. While the exact definition and population size of urbanized areas varies among different countries, urbanization is attributed to growth of cities."[৬২]

Wikipedia অনুসারে-জাতিসংঘের সংজ্ঞানুযায়ী নগর হলো "movement of people from rural to urban areas with population growth equating to urban migration."[৬৩]

সুদূর অতীতকাল থেকে ভারতীয় ভূ-খন্ডে ছোট বড় নানান ধরনের নগর গড়ে উঠলেও প্রথম নগর গড়ে উঠার ইতিহাস এখনও পরিষ্কার নয়, তবে হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে প্রথম নগর গড়ে উঠার ইতিহাস পাওয়া যায়। এই নগরগুলো প্রায় এক হাজারেরও বেশী বছর ধরে টিকে ছিল। এর পরই নগর গড়ে উঠার ভাটা পড়ে।। ১২০০ খ্রিস্টাব্দের পর আবার শহর তৈরীতে জোয়ার আসে।"[৬৪] ঐতিহাসিকদের মতে, প্রাচীন সভ্যতার জন্ম এবং বিবর্তন আলোচনায় দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায় যে, অবস্থার বিশেষ অনুকূলে নগর জীবনের প্রথম বিকাশ ঘটে পশ্চিম এশিয়ার নদী উপত্যকায়। জর্ডান নদীর উপত্যকায় জেরিকো (Jerico) আজ থেকে আনুমানিক নয় হাজার বছর আগে পৃথিবীর প্রথম নগর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৬৫] ঐ সময় থেকে নগর জীবনের ব্যাপক বিকাশ ঘটতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চতুর্থ সহস্রাব্দের শেষ দিকে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস উপত্যকা বা মেসোপটেমিয়ায় নগরের পত্তন আরম্ভ হয়েছিল এবং মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাকে কেন্দ্র করেই নগরের বিকাশ ঘটে। উল্লেখ্য যে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার শহরের কাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিল। দুটিই নদীর ধারে ছিল। এ শহরের মধ্যে আবার দুটি ভাগ ছিল একটি হচ্ছে দুর্গ যেটি উঁচু জমির উপর ছিল আর অন্যটি হচ্ছে এলাকায় শহর যেখানে অধিকাংশ লোকই বাস করত। এছাড়া সবরমতি নদীর শাখার উপর লোথাল ছিল খাম্বাজ উপসাগরের সামুদ্রিক বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। এ লোথাল বন্দর দিয়েই মেসোপটেমিয়ার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। বেলুচিস্থানের মাকরান উপকূলেও আর একটি বন্দরের সন্ধান পাওয়া যায়, যার কাঠামো ছিল একই ধরনের।[৬৬] ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকেই হরপ্পা সভ্যতার পতন শুরু হয়েছিল। এই পতনের কারণ হিসাবে বলা যায় যেহেতু শহরগুলো নদীর ধারে ছিল, অতএব বন্যার ফলে এগুলো ধ্বংস হয়েছিল। সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ছিল শহরগুলোতে প্রথম থেকেই প্রায় প্রতিটি বাড়ির মধ্যে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আবর্জনা ফেলা হত মাটির নীচের কুয়াতে। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে পরবর্তী নগরায়ন হরপ্পা সভ্যতার প্রভাবের ফলে হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক পূর্বে গঙ্গা ও ভাগীরথী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে 'Gangariddi' নামক অঞ্চলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যা বাংলার প্রাচীনতম শহর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রাক-মুসলিম বাংলার নগরগুলোর

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। দ্বিবজ্জনের মতে দিনাজপুর জেলাস্থ বেলওয়া (ঘোড়াঘাট থানা), হরিনাথপুর, চরকাই (নবাবগঞ্জ থানা), দেবীপুর (হাকিমপুর থানা) ও ফুলবাড়ী স্থানেই টলেমী কথিত পেন্টাপোলিশ এবং পাল আমলের তাম্রশাসন পট্টে, উল্লেখিত পঞ্চম নগরীর অবস্থান ছিল। এসব অঞ্চল যে একদা সমৃদ্ধশালী প্রাচীন সংস্কৃতি ও পুরাকীর্তির কেন্দ্র ছিল তাতে সন্দেহ নেই।[৬৯]

প্রাক-মুসলিম বাংলার গুরুত্বপূর্ণ তীর্থনগরী ছিল **ত্রিবেণী**। যমুনা-সরস্বতী-ভাগীরথীর তিন মুক্তবেণী'র সংযোগস্থলে এই তীর্থ নগরী অবস্থিত। সেনামলে তীর্থ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ত্রিবেণীর খ্যাতি ছিল।[৭০]

বাংলার সুপ্রাচীন শহর **বিক্রমপুর**। হিন্দু ধর্মাবলী সেন রাজাদের রাজত্বকালে ঢাকার অদূরে বিক্রমপূর গড়ে ওঠে।[৭১] নগরটি বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ জেলার অদূরে ১৫ মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। দশম শতক থেকে বার শতক পর্যন্ত বিক্রমপুর ছিল একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র। ঐ সময়ে তাম্রলিপিগুলোতে উল্লেখিত "জয় স্কন্ধাকার" শব্দ সমষ্টিকে এই শহরের নামের সাথে যুক্ত দেখে এর রাজনৈতিক ও সামরিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।[৭২] সেন শাসনামলে বিক্রমপুর শাসনকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করে। মুসলমানদের আগমনের পর তথা বখতিয়ার খলজির সময় শহরটি প্রশাসনিক সদর দপ্তর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সামরিক প্রয়োজনে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। শহরটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বড় কেন্দ্র ছিল। অতীশ দ্বীপঙ্করের জন্মভূমি বিক্রমপুরের স্মৃতি এখন ও বিদ্যামান।

নওগাঁ জেলার **পাহাড়পুর বা সোমপুর** নগরটি ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। মূলত পাল রাজাদের আমলেই এর গোড়াপত্তন হয়। এটি ছিল

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ হিমালয় অঞ্চলের বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার।[৭৩] বর্তমানের কুমিল্লা শহর হতে ৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এ নগরের অবস্থান। নগরটির প্রতিষ্ঠা কাল ছিল পঞ্চম শতক হতে এয়োদশ শতক পর্যন্ত।[৭৪] দেব রাজবংশের শাসনে এখানে রাজধানী শহর হিসেবে দেবপর্বত' এর বিকাশ ঘটেছিল। এখানে পঞ্চাশটিরও বেশী এলাকা জুঁড়ে ময়নামতির ধবংসাবশেষ বিস্তৃত। মূলত এই নগরটি((ময়নামতি)) ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিত শীতলক্ষ্যা পূর্ব সীমান্তে প্রবাহিত মেঘনা আর উত্তর সীমান্তে প্রবাহিত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র এবং দক্ষিণ সীমান্তে বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরীর স্রোতধারা চারদিকে নদীবেষ্টিত ভূ-খন্ডটি অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রথমে সুবর্ণবীথি, পরবর্তী সময়ে সূর্বণগ্রাম নামে পরিচিত ছিল। কথিত আছে যে, হিন্দু রাজারা তাদের রাজধানী এখানে স্থানান্তরিত করেছিল। এটি মূলত সামরিক দিক থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে স্থানীয় রাজা দনুজমর্দন দেবের রাজধানী ছিল এটি। পরবর্তীতে মুসলমান সুলতানদের সফলতায় শহরটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সুলতান শামসুদ্দিন ফীরূজশাহ কর্তৃক ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে এখানে টাকশাল শহর স্থাপন করা হয়। ফলে এটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের মর্যাদা পায়।[৭৫]

প্রাক-মুসলিম বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগর ছিল **রামাবতী**। নগরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র রামপাল (১০৭২-১১২৬)। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এ নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গা ও মহানন্দার সংযোগস্থলে এটি অবস্থিত। পরবর্তীতে এ নগরীর পাশেই লখনৌতি নগরের পত্তন হয়।[৭৬]

বর্তমানের ভারতের রাজমহল থেকে ২৫ মাইল ভাটিতে গঙ্গা-মহানন্দার সংগমস্থলে ১৪/১৫ মাইল জুড়ে **লখনৌতি** নগর বিস্তৃত ছিল। গেনামলের

Dhaka University Institutional Repository

শেষদিকে লক্ষ্মণসেন (১১৭৯-১২০৬) এই সুবিস্তৃত নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। তার নামানুসারে এ নগরীর নামকরণ করা হয় বলে পন্ডিতদের ধারণা। পরবর্তীতে গঙ্গা ও মহানন্দার গতিধারা পরিবর্তনের কারণেই এ নগরটি পরিত্যক্ত হয়। অর্থাৎ মুসলমানরা এসে নগরটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। মুসলমানদের আগমনের পর বা ইবনে বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের পর এই নগরীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কারণ তিনি এখানে রাজধানী স্থাপন করে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। মুসলিম শাসনামলে শহরটি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে শহরটি আবার টাকশাল শহরের মর্যাদা পায়। বর্তমানে শহরটির ধ্বংসাবশেষ পাশ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুর্গ, পুকুর ও রাস্তার ধ্বংসাবশেষসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুপরিচিত গ্রামরূপে বিদ্যমান।[৭৭]

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার ত্রিবেণীর কিছু দূরে স্বরস্বতী নদীর তীরে ছিল **সপ্তগ্রাম**। সাতটি গ্রাম নিয়ে গঠিত বলে সপ্তগ্রাম বলা হত। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সপ্তগ্রামে পাল-সেন যুগের বহুমূর্তি পাওয়া গেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, জাফর খান গাজী সপ্তগ্রাম দখল করার পূর্বে এটি একটি শহর ছিল। এটি ছিল মূলত বৃহৎ নগরও বন্দর। এ নগরের সমৃদ্ধির ফলে সেন রাজাদের রাজধানী বিজয়পুরের মর্যাদা অবলুপ্ত হয়ে যায়।[৭৮] মুসলমানদের আগমনের পর শহরটির পুনর্জাগরণ ঘটে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়। সপ্তগ্রাম বন্দর সম্পর্কে ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ রায় বর্ণনা করেন যে, সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে প্রধানত বহির্বাণিজ্য করত, বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় বণিক ও বিদেশী বণিকগণ।[৭৯]

মূলত গ্রামকে কেন্দ্র করে প্রাক-মুসলিম বাংলার নগরগুলো গড়ে উঠেছিল। কোন কোন গ্রাম কখনও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়ায় এবং শাসন কাজের স্থান নির্বাচিত করায় গুরুত্ব ও মর্যাদায় পরবর্তীতে নগরের মর্যাদা পেয়েছিল। বড় বড় নদীর ঘাটে ও সমুদ্রের খাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অনেক গ্রামই বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। পুনর্ভবা নদীর তীরে হওয়ায় কোটীবর্ষের সামরিক গুরুত্ব ছিল। তাছাড়া বিক্রমপুর গড়ে উঠেছিল শুধুমাত্র শাসন কেন্দ্র হিসাবেই নয় এর সামরিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল। সোমপুর (বর্তমান পাহাড় পুর), ত্রিবেণী প্রভৃতি নগর গড়ে উঠেছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে। তবে কম বেশি ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রেরণা সর্বত্রই ছিল। প্রায় প্রত্যেকটি নগর প্রশস্ত ও প্রচলিত স্থল ও জলপথের উপর অথবা সংযোগকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। ফলে ব্যবসায়- বাণিজ্য সঠিকভাবে পরিচালিত হত । কিন্তু সপ্তম শতক ও তারপর থেকে নগর ও বন্দর কেন্দ্রিক এসব ব্যবসায়-বাণিজ্য বিশেষত সামুদ্রিক বর্হিবাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে নগরগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি বদলাতে আরম্ভ করে এরং নগরগুলোর বাণিজ্যিক প্রাধান্য আর বজায় থাকেনি।[৮০]

প্রাক-মুসলিম বাংলার নগরায়নের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এর পরবর্তীতে আবার পাল ও সেন রাজবংশের সময়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক শক্তির অভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে। উল্লেখ্য যে পাল রাজাদের মতো প্রভাবশালী রাজবংশের কোন রাজাই রাজধানী নির্মাণ করেননি। এমনকি ধর্মপাল কিংবা দেবপালও নন। জয়স্কন্ধাবার (military encampment) থেকেই তারা রাজকার্য ও যাবতীয় শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তাই এ সময়ের নগরগুলো ছিল গ্রামেরই সমৃদ্ধতর সংস্করণমাত্র। এরূপ পরিস্থিতিতে একান্ত গ্রামনির্ভর, কৃষিনির্ভর

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতির সমাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক শক্তির আর্বিভাব ঘটেছিল।[৮১] যার ফলে একক মানসম্পন্ন কোন মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। কারণ সপ্তম শতক পর্যন্ত স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) ও রোপ্যমুদ্রা (রূপক) প্রচলিত থাকলেও সেনামলে এসব মুদ্রা উধাও হয়ে যায়। এমনকি তাম্রমুদ্রা (tankah)ও প্রচলিত ছিল না। মুদ্রা হিসেবে কড়ি প্রচলিত ছিল। মুদ্রার উপস্থিতি না থাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে বাণিজ্যিক পথগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির সংকোচন শুরু হয়। ফলে নগরগুলো তাদের পুরনো ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নগরও বন্দরগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের আগমনের পর মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে।[৮২] তাছাড়া পুরাতন নগরের সাথে নতুন নগরের সংযোজন ঘটে ও নতুন নগরের গোড়াপত্তন হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* vol. 1, Karachi, 1963, pp. 35-36

২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলার ইতিহাস* (২য় খন্ড), ৩০ ভাদ্র ১৩৮০, পৃ.৭৪

৩. মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৩-৪

৪. A Cunningham, *Archaeological Survey of India Report* 1879-1880, vol.xv, p.145; H.Blockmann, *Contributions to the Geography& History of Bengal*, Culcutta, 1968, p. 03

৫. R.C.Majumdar, *History of Bengal*, Vol.1, pp. 565-567.'Lama Taranatha's, Account of Bengal' vol. xvi, 1940, p. 238.

৬. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)* কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১১৪-১১৯

৭. ঐ

৮. ঐ, পৃ. ১১৮-১২০

৯. ঐ, পৃ. ১১৪

১০. ঐ , পৃ. ১২৩

১১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ১ম খন্ড (প্রাচীন যুগ), কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১৫৮

১২. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

১৩. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৩-৩৩৮

১৪. ঐ

১৫. Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal,* Dacca, 1967, pp. 212-220; মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

১৬. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২১-৪২৩

১৭. ঐ

১৮. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

১৯. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ১ম খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫৭

২০. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

২১. ঐ

২২. Kamrunnesa Islam, *Aspects of Economic History of Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1984, p.110.

২৩. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭

২৪. আবদুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৬৮

২৫. Hameeda Khatoon Naqvi, *Urban Centres & Industries in Upper India*, Asia publishing House, Bombay, 1928, p. 14

২৬. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬

২৭. Kamrunnesa Islam, *op. cit*, p.133.

২৮. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩

২৯. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০

৩০. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

৩১. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৩২. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪

৩৩. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

৩৪. ঐ, পৃ. ৫

৩৫. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, ২৬১-২৬২

৩৬. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

৩৭. ঐ

৩৮. রমেশ চন্দ্র মজুমদার , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. প্রভাতাংশু মাইতি, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস)*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৪৫

৪০. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩

৪১. R.C Majumder, *History of Bengal*, Vol. 1, pp. 565-567.

৪২. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, *গৌড়ের ইতিহাস*, মালদহ, ১৯০৯, পৃ. ২১১

৪৩. ঐ, পৃ. ২০২-২০৩

৪৪. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৮-৪২৩

৪৫. ঐ, পৃ. ১০১

৪৬. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালির ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯, পৃ. ৮৩-৮৪

৪৭. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী* সম্পাদিত, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩, পৃ. ৬১

৪৮. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

৪৯. *ভারতকোষ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, পৃ. ১৪৫

৫০. B.D.Chattopahyaya, *Urban Centres in Early Bengal*, Archaeological Perspectives, Pratna Samiksha 2&3, (1993-94) pp. 169-192

৫১. রামশরণ শর্মা, *ভারতে নগর অবক্ষয়*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৪

৫২. ঐ, পৃ. ৭

৫৩. ড.মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী (অনুদিত), *কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম্* (কোটিল প্রণীত অর্থশাস্ত্র), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৭০

৫৪. V.Gordon Child, *The Urban Revolution*, in Greogory L.Posschl (ed), Ancient Cities of the Indus, 1950, pp. 12-17

৫৫. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, "নগরায়ন, আদি- ঐতিহাসিক ও প্রাক-মধ্যযুগ" *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৪৯৪

৫৬. ঐ

৫৭. রামশরণ শর্মা, *ভারতে নগর অবক্ষয়*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৪

৫৮. Dilip K Chakrabarti, *The Archaeology of Indian Cities*, New Delhi, 1998, p. 249

৫৯. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪

৬০. *The New Encyclopedia of Britanica*, 1975, vol. 11, p. 951

৬১. R.K. Bharadwaj, *Urban Development in India*, National, Delhi, 1974, p.1

৬২. http://www.perseus.tufts.edu/cgi bin/ptext?lookup=Plut.+Caes.+60.1

৬৩. http://www.infopak.gov.pk/History.aspx

৬৪. অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২

৬৫. ঐ, পৃ. ২৭

৬৬. ঐ

৬৭. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪

৬৮. *বাংলাপিডিয়া*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) চতুর্থ খন্ড, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৯৬

৬৯. আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৭৩-১০৭

৭০. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮-২৯৯

৭১. ঐ. ২৯৪

৭২. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৯

Dhaka University Institutional Repository

৭৩. আবদুল্লাহ ফারুক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

৭৪. Dilip K. Chakrobarti, *Ancient Bangladesh*, A Study of the Archaeological Sources, New Delhi, Oxford University Press, 1992, p. 124.

৭৫. মো:আখতারুজ্জামান, "নগরায়ন: মধ্যযুগ উপনিবেশিক পর্ব", ২০০৭, পৃ. ৯

৭৬. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২-৩০৩

৭৭. খান-সাহেব আবিদ আলী খান, *গৌড় ও পান্ডুয়ার স্মৃতি*, চৌধুরী শামসুর রহমান সম্পাদিত, ঢাকা , ১৯৮৫. পৃ. ০১

৭৮. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯

৭৯. অনিরুদ্ব রায়, *সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি সমীক্ষা*, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৪

৮০. নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮১

৮১. ঐ, পৃ. ৩১৫

৮২. Md. Akhtaruzzaman, " Process of Urbanization in Early Muslim Bengal ", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Hum, 46(i), June, 2001, pp. 47-74

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও নগরায়ন প্রক্রিয়া

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে তথা মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছে। বাংলা মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকারে আসার আগে এ এলাকায় আরবদের আগমন ঘটে। বাণিজ্যিকসূত্রে আরব বণিকেরা তখন এদেশে আসতো। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত আব্বাসি আমলের মুদ্রার উপর নির্ভর করে অনেকে মনে করেন যে, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগ থেকেই এখানে মুসলিম বসতির সূত্রপাত হয়েছিল। এ ব্যাপারে যুক্তিনির্ভর তথ্য পাওয়া যায়নি, ধারণা করা হয় বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই এ মুদ্রার আগমন ঘটেছিল।[১] মুসলিম ভূগোলবিদদের বিবরণ, বিভিন্ন কিংবদন্তী ও লোককাহিনী অনুযায়ী বাংলার সাথে বিদেশী মুসলমানদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রাচীনকালের। মুসলিম ভূগোলবিদদের বর্ণনানুযায়ী বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে মুসলমানদের বাণিজ্যতরী ভিড়ত, সেখানে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বেচাকেনা হত। এভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই বাংলার সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক গড়ে উঠে।[২] এ বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বাংলার বিভিন্ন উপকূলে মুসলমানদের বসতি গড়ে উঠা হয়তো অসম্ভব নয়। তবে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানদের বসতি ছিল এমন কোন তথ্যপ্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া য়ায়নি।[৩] শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের জন্যই বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে সুফি ও মাসায়েকদের আগমন ঘটেছিল। আমাদের এ গবেষণায় বাংলায় মুসলমানদের আগমন, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও বাংলার নগরায়নে

মুসলমান শাসকদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়টিকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে:

১. বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা এবং

২. সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় নগরায়ন প্রক্রিয়া

১. বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা

অনেকে মনে করে থাকেন যে, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগে বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য সুফিদের আগমন ঘটেছিল। এ সব সুফি-সাধকদের মধ্যে যাদের নাম জানা যায়, তাঁরা হলেন বাবা আদম শহীদ (ঢাকা), শাহ সুলতান রুমী (ময়মনসিংহ) ও শাহ সুলতান বল্‌খী মাহিসওয়ার (বগুড়া)। তাদেরকে কেন্দ্র করে নানা কাহিনী-কিংবদন্তী প্রচলিত আছে কিন্তু তাঁদের আগমনের সঠিক সন-তারিখ আমাদের কাছে অজ্ঞাত। মুসলিম শাসনের আগেই তাঁরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিলেন একথাও জোর দিয়ে বলা যায় না।[৪] সুতরাং তুর্কী আক্রমনের আগে বাংলার সঙ্গে আরব মুসলমান বণিকদের সত্যিই যোগাযোগ ছিল তবে সে যোগাযোগ ছিল শুধুমাত্র বাণিজ্যের খাতিরেই। ফলে বাংলায় মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল একথা বলার পক্ষে কোন যুক্তি বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে এটা নিশ্চিত যে, বাংলার সঙ্গে মুসলমানদের প্রাথমিক যোগাযোগ ছিল একমাত্র ব্যবসার মাধ্যমেই।

পরবর্তী পর্যায়ে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আফগানিস্থানের গরম্‌শিরের অধিবাসী ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ছিলেন জাতিতে তুর্কী, বংশে খলজি এবং বৃত্তিতে সৈনিক। উচ্চাভিলাষী ও দুর্জয় সাহসী ইখতিয়ার উদ্দিন ভাগ্যান্বেষণে বের হন এবং গজনীতে এসে

শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর অধীনে সৈন্যবিভাগে কর্মপ্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হন। কারণ তিনি দেখতে যেমন সুদর্শন ছিলেন না, দৈহিক দিক থেকেও তেমনি ছিলেন খর্বকায় এবং দীর্ঘবাহু বিশিষ্ট।[৫] অত:পর তিনি পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বদাউনে পৌঁছান। বদাউনের শাসনকর্তা মালিক হিজবারুদ্দীন এর অধীনে নগদ বেতনে কিছুদিন চাকুরী করার পর তিনি অযোধ্যায় গমন করেন এবং অযোধ্যার শাসনকর্তা হুসামুদ্দীন উগলাবাক তাকে '*ভিউলী*' ও '*ভাগত*' নামে দুটি পরগনার *জায়গীর* দান করেন (ভিউলী ও ভাগত আধুনিক উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর জেলায় অবস্থিত) এবং মুসলমান রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে সীমান্তরক্ষীর কাজে নিযুক্ত করেন।[৬]

এখানে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির উৎসের সন্ধান পান। ইবনে বখতিয়ার খলজির *জায়গীর* সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় তিনি পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যের সংস্পর্শে আসেন এবং স্বীয় রাজ্যবিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যদিও পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্যগুলোতে পূর্বেই তুর্কী বিজয়ের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়; তদুপরি তাদের মধ্যে অন্তবিরোধ থাকাতে সংঘবদ্ধ হওযা সম্ভব ছিল না, আর ইবনে বখতিয়ার খলজির ন্যায় বীরের পক্ষে এটাই ছিল উপযুক্ত সুযোগ। তিনি কিছু সংখ্যক সৈন্য একত্রিত করে এক একটি হিন্দুরাজ্য আক্রমন ও লুন্ঠন করতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে গোবিন্দপাল দেবের রাজধানী আক্রমন করেন। গোবিন্দপাল গৌড়েশ্বর সেনরাজের নিকট থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে সংঘারামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ইবনে বখতিয়ার খলজি সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে বিহার দূর্গ অধিকার করেন। দূর্গের অধিবাসীগণ অধিকাংশই নিহত হয়। যুগ যুগ সঞ্চিত বহু সম্পদ লুন্ঠিত হয় এবং বহু গ্রন্থ ভস্মীভূত করা হয়। দূর্গ বা বিহারবাসীরা অধিকাংশই ছিলেন মস্তক মন্ডিত বৌদ্ধভিক্ষু। তিনি আসলে ওদন্তপুর বিহার জয় করেন।[৭] ওদন্তপুর[৮] ধ্বংসের প্রায় এক বছর পর তিনি

Dhaka University Institutional Repository

পুনরায় দক্ষিণ বিহারে অভিযান করে ঐ অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করেন (১২০০ খ্রিস্টাব্দ)। বিহার অঞ্চলে লুণ্ঠন অপেক্ষা আধিপত্য স্থাপনেই সচেষ্ট হন। এছাড়া তিনি স্থানে স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করেন এবং বিজিত অঞ্চলের জন্য শাসন ব্যবস্থাও রচনা করেন।

বিহার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বিজয়ের ফলে ইবনে বখতিয়ার খলজির নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং চারদিকে আতংকের সৃষ্টি হয়। বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেন তখন নদীয়ায় ছিলেন। তার দরবারের পন্ডিতরা তাকে জানালেন যে প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বাংলা তুর্কীদের অধিকারে যাবে। সারা উত্তর ভারতে মুসলিম তুর্কীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বিহার জয় করেছেন। এর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে তুর্কীরা বাংলা আক্রমন করবে এজন্য তারা রাজাকে পরিবার পরিজনসহ নিরাপদ স্থানে যাওয়ার অনুরোধ করেন।[৯] কিন্তু লক্ষ্মণসেন (রায় লখমনিয়া) তাঁর দেশ ছেড়ে যাওয়া পছন্দ করলেন না। তখন বেশির ভাগ ব্রাহ্মণ বঙ্গ ও কামরুপে চলে গেলেন।[১০]

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই বঙ্গের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও রক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। বিহার বিজয়ের পরের বছর তিনি নানা স্থানে থানা স্থাপন করে রাজধানী নদীয়া আক্রমনের জন্য যাত্রা করেন।[১১] তিনি এত দ্রুতগতিতে নদীয়া শহরে উপস্থিত হলেন যে মাত্র আঠার জন অশ্বারোহী তার সাথে ছিলো এবং অবশিষ্ট সৈন্য তার পেছনে ছিল।[১২] ইবনে বখতিয়ার খলজি যখন নগর দ্বারে উপস্থিত হলেন তখন কাউকে তিনি উপদ্রব করেননি। তার শান্ত ও শিষ্টভাব দেখে কারো মনে কোন সন্দেহ হয়নি যে, তিনিই ইবনে বখতিয়ার খলজি বরং

Dhaka University Institutional Repository

তাদের মনে হয়েছিল তিনি অশ্ব বিক্রয়ের জন্য এসেছেন। এই সময় লক্ষ্মণসেন (লখমনিয়াহ) ভোজনে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় তিনি প্রাসাদে আর্তনাদের শব্দ শুনতে পান। তিনি প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে, খালি পায়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান।[১৩] রাজা লক্ষ্মণসেন হয়ত ভাবতেই পারেননি যে ইবনে বখতিয়ার খলজি তেলিয়াগড়ের গিড়িপথ পরিত্যাগ করে ঝাড়খন্ডের দুর্ভেদ্য অরণ্যময় দুর্গম পথে নদীয়া আক্রমন করবে। সুতরাং নদীয়া সুরক্ষিত করার কোন প্রয়োজন তিনি মনে করেননি। তাছাড়া মাত্র আঠার জন সৈন্য নিয়ে তিনি ঘোড়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে নদীয়ায় (১২০৪ খ্রিস্টাব্দে) প্রবেশ করেন। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন যে, "The surprise of a city by foreign soldiers disguised as horse-dealers cannot be dismissed as an impossible figment of the imagination[১৪]" সত্যিকার অর্থেই ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে মাত্র আঠারজন সৈন্য নিয়ে ইবনে বখতিয়ারের নদীয়া বিজয় ছিল ইতিহাসের একটি চমকপ্রদ ঘটনা। লক্ষ্মণসেনের পলায়নের পর নদীয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। ইবনে বখতিয়ার খলজি তিন দিন নদীয়া লুট করে অনেক ধন-রত্ন, হাতী-ঘোড়া হস্তগত করেন এবং নদীয়া ছেড়ে উত্তরবঙ্গে এসে বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় (লক্ষণাবতী) অধিকার করেন এবং সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাচীন লক্ষণাবতী মুসলমান শাসনামলে লখনৌতি নামে পরিচিত হয়। এছাড়া রাজ্যের চতুর্পাশ তিনি অধিকার করেন এবং সর্বত্র খুৎবা পাঠ ও মুদ্রার প্রচলন করেন ।[১৫]

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর আলী মর্দান খলজি (১২১০-১২১২ খ্রিস্টাব্দ) ক্ষুদ্র মুসলিম সাম্রাজ্যকে লক্ষণাবতী সালতানাতে পরিণত করেন। ১২১০ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দীন আইবেকের মৃত্যুর পর আলী মর্দান খলজি সুলতান উপাধি ধারণ করে নিজ নামে খুৎবা পাঠ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে সুলতান হুসামউদ্দীন ইওয়াজ খলজি (১২১২-১২১৭ খ্রিস্টাব্দ) সাম্রাজ্যকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুদ্রায় তার নামের পাশে ইলতুৎমিসের নাম উৎকীর্ণ করেন। পরবর্তীতে তিনি মুদ্রা হতে ইলতুৎমিসের নামটি বাদ দেন এবং 'সুলতান-আল-মুয়াজ্জাম' উপাধি ধারণ করে নিজের নামে খুৎবা পাঠ এবং মুদ্রা প্রচলন করেন।[১৬] সুলতান ইওয়াজ খলজি লক্ষণাবতী সালতানাতকে (ভূ -খন্ডকে) রাঢ় (রাধা, গঙ্গার দক্ষিণে) এবং বরিন্দ (বরেন্দ্র, গঙ্গার উত্তরে) এ দু'টো প্রদেশে (*wilayat*) বিভক্ত করেন এবং রাঢ়কে যোগ্য উত্তরাধিকারী আলী শের বিন ইওয়াজের অধীনে ন্যস্ত করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ উল্লেখ করেন যে সমগ্র গৌড় অঞ্চল ইওয়াজ খলজির হাতে চলে গিয়েছিল এবং তিনি তার আমিরদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। এই সময়ে জাজনগর, তিরহুত, কামরুপ ও বঙ্গ (পূর্ব বঙ্গ) রাজারা তাকে কর প্রদান করত। উল্লেখ্য যে, ইলতুতমিসের পুত্র নাসিরউদ্দীন মাহমুদের নেতৃত্বে দিল্লীর সেনাবাহিনী লক্ষণাবতী আক্রমন করে এবং ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইওয়াজকে হত্যা করে।[১৭] ফলে লক্ষণাবতী সালতানাত দিল্লীর একটি প্রদেশে (*wilayat*) পরিণত হয় এবং নাসিরউদ্দীন মাহমুদ এই প্রদেশের প্রশাসক নিযুক্ত হন। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর প্রেরিত ভাইসরয় বা শাসক স্বাধীন হওয়ায় জন্য বার বার লক্ষণাবতীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে কারণে লক্ষণাবতী এ সময়ে 'বুলগকপুর (বিদ্রোহী অঞ্চল)' নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৮]

তুঘরিলের বিদ্রোহ দমন করে বলবন ১২৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র বুগরা খানকে লক্ষণাবতীর শাসক নিয়োগ করেন। এই সময়ে লক্ষণাবতী একটি *'ইকলিম'* এর মর্যাদা লাভ করে। *'ইকলিম'* হলো প্রদেশ থেকে বড় এবং এর শাসক গর্ভনরের চেয়ে ক্ষমতাশালী। ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে বলবনের মৃত্যুর পর *'ইকলিম*

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণাবতী' পুনরায় *'লক্ষণাবতী সালতানাতে'* রূপান্তরিত হয়। বুগরা খান নাসিরউদ্দীন উপাধী গ্রহণ করেন, মুদ্রা জারি করেন এবং নিজ নামে খুৎবা পাঠ করেন।[১৯] এই সময়ে দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে লক্ষণাবতী সালতানাতের আবির্ভাব ঘটেছিল। বুগরা খানের পুত্র সুলতান রুকনউদ্দীন কায়কোয়াশ (১২৯১-১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) এবং সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজশাহের সময়েও (১৩০১-১৩২২ খ্রিস্টাব্দ) লক্ষণাবতী সালতানাত একই মর্যাদা এবং ক্ষমতাশালী ছিল।

১২৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষণাবতী সালতানাত বিস্তার লাভ করেছিল। সাতগাঁও, পান্ডুয়া, ত্রিবেনী, সোনারগাঁও, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ এর অন্তর্ভুক্ত হলো। রাজ্যবিজয়ের সাথে সাথে সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজের পুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই সুযোগে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে লক্ষণাবতী আক্রমণ করে দিল্লীর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। উক্ত সময়ে লক্ষণাবতী সালতানাত ভেঙ্গে চারটি প্রদেশ (*wilayat*) : বিহার, সাতগাঁও, সোনারগাঁও, ও লক্ষণাবতীতে পরিণত হয়। তাছাড়া দিল্লীর প্রতিনিধি হিসেবে কদর খান, মালিক ইজ্জউদ্দিন ইয়াহিয়া এবং বাহরাম খান বা তাতার খান যথাক্রমে লক্ষণাবতী, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও শাসন করতেন। এছাড়া বিহার ছিল জয়েনউদ্দিন মজিদ-উল-মূলক এর অধীনে। বাহরাম খার মৃত্যুর পর তার বর্মরক্ষক ফকরউদ্দিন ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ফকরউদ্দিন মোবারক শাহ উপাধি ধারণ করে বাংলা নামে নতুন সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন। অন্যদিকে কদর খানের মৃত্যুর পর তার সেনাধ্যক্ষ আলী মোবারক লক্ষণাবতীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ফিরুজাবাদ টাকশাল থেকে আলাউদ্দিন আলী শাহ নামে মুদ্রা জারি করেন। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেকে

Dhaka University Institutional Repository

"বিশ্বাসীদের নেতার সাহায্যকারী" হিসেবে ঘোষণা দেন। লক্ষণাবতীর আলাউদ্দিন আলী শাহ এবং সোনারগাঁয়ের ফকরউদ্দিন মোবারক শাহের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইলিয়াস শাহের উত্থানের পথ প্রশস্ত করে। এ সময়ে বাংলায় দু'টো সালতানাতের আর্বিভাব ঘটেছিল; শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের অধীনে লক্ষণাবতী, ফিরুজাবাদ, সাতগাঁও এবং ফকরউদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দ) ও তাঁর পুত্র ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ্ (১৩৪৯-১৩৫২ খ্রিস্টাব্দ) এর সোনারগাঁও-চট্টগ্রাম। ফকরউদ্দিন মোবারক শাহ্ সোনারগাঁও রাজ্যের সীমানা চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সোনারগাঁও বিজয়ের ফলে ফকরউদ্দিন মোবারক শাহের বংশের অবসান ঘটে।[২০] লক্ষণাবতীর সাথে সোনারগাঁও সংযোগের ফলে দুটো সালতানাতের অবসান ঘটে। ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলার সুলতান হন। তার পূর্বে বাংলার কোন শাসককেই পুরো বাংলার সুলতান বলা হত না; তাদেরকে হয় লক্ষণাবতীর না হয় সোনারগাঁও-র সুলতান বলা হতো। প্রথমবারের মত ইলিয়াস শাহ বাংলার সুলতান হিসেবে পরিচিতি পান। এজন্যই শামস-ই-সিরাজ আফীফ তাকে *'শাহ্-ই-বাঙ্গালাহ'* বা *'শাহ্-ই-বাঙ্গালীয়ান'* বা *'সুলতান-ই- বাঙ্গালাহ'* হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[২১] এভাবে লক্ষণাবতী রাজ্য *'বাংলা সালতানাতে'* পরিণত হয়। বাংলা সালতানাতে বিহার রাজ্যের কিছু অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিরহুত ও দ্বারভাঙ্গায় মুহাম্মদ বিন তুঘলকের নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং তিনি সেখানে একটি দূর্গ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। দ্বারভাঙ্গাকে 'তুগলকপুর' নাম দেওয়া হয়েছিল।[২২] এরই ধারাবাহিকতায় ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দ- ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ শেরশাহের ভারতের সাথে বাংলাকে সংযোজন করার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র হিসেবে টিকে ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

২. সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় নগরায়ন প্রক্রিয়া

ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে মুসলমানদের আগমনের ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পরিবর্তনের বহি:প্রকাশ ঘটেছিল নগরায়নের ক্ষেত্রে যেখানে অধিক সংখ্যক নগরকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল এবং পূর্ববর্তী তথা পাল ও সেন নগরকেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটেছিল।[২৩] ইবনে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিম শাসন সূচিত হলেও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গতি সঞ্চার হয়েছিল আরো দেড়শত বছর পরে। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হাজী শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহই প্রথম সমগ্র অঞ্চলকে একত্রিত করে উক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বাঙলা নামে অভিহিত করেন এবং নিজেকে *'শাহ-ই- বাঙ্গালীয়ান'* উপাধিতে ভূষিত করেন।[২৪] সুকুমার সেন বলেছেন যে, বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বাংলা নিয়ে যে বাঙলা আমাদের নিকট পরিচিত তার জন্ম প্রাক-মুসলিম আমলে হয়নি।[২৫] সুলতানী আমলেই প্রথম সমগ্র বঙ্গদেশ বাঙলা নামে পরিচিত হয়।

মূলত মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম শাসনের ইতিহাস। বাংলায় মুসলমানদের আগমন এবং দীর্ঘদিন রাজদন্ড তাদের হাতে থাকায় এদেশের রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বড় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সনাতন ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণের সাথে প্রযুক্ত হয় ইসলামি সংস্কৃতি। তাছাড়া বাংলার সুলতানদের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ে (১২০৪-১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ) মুসলমান শাসকগণ সীমিত অঞ্চলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এ সময়ে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিল্লীর প্রতিনিধি হিসেবে আঞ্চলিক শাসনকর্তার মর্যাদা লাভ করেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানীর মতে, লক্ষণাবতী বিজিত হওয়ার পর হতে সেখানকার সকল শাসকই দিল্লীর তরফ হতে নিযুক্ত হয়েছিল।[২৬] ফলে নিজেদের ক্ষমতাকে সংহত করে খুব ধীরগতিতে সমাজ ও অর্থনীতির উপর

Dhaka University Institutional Repository

তাদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। দ্বিতীয় ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ) কারণ এই দুশো বছর ছিল সুলতানী আমলের স্বর্ণযুগ। এ সময়ে বাংলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। কারণ অষ্টম শতক থেকে প্রথম আরব বণিকদের মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তীতে সুফি-সাধকদের তৎপরতায় মুসলিম সমাজের বিস্তার ঘটতে থাকে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ অবস্থার আরও উন্নতি ঘটেছিল। এরূপ প্রেক্ষাপটে সুলতানী বাংলার নগরসমূহের ভূমিকা তার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

২.১ নগরকেন্দ্রের প্রকারভেদ ও প্রকৃতি

সমসাময়িক উৎসগ্রন্থ, মুদ্রা, উৎকীর্ণ লিপি এবং বিদ্যমান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে সুলতানী আমলে বাংলায় যে সমস্ত নগরীর সন্ধান পাওয়া যায়, সে নগরীসমূহ কখনও রাজধানী শহর, কখনও টাকশাল নগরী আবার কখনও বা বাণিজ্যিক এবং ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। উদ্দেশ্য এবং কর্মভেদে তাই বাংলার এ নগরসমূহকে তাদের বিশেষ ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। একই শহর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মের জন্য বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন একটি শহর একাধারে রাজধানী, বন্দর নগরী, টাকশাল নগরী বা সেনাছাউনি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ অনেকগুলো কাজ অনেক সময় একটি শহর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। রাজধানী শহরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শহরের কেন্দ্রে মজবুত প্রাকারবেষ্টিত দূর্গ। দূর্গ বলতে অনেকে সাধারণভাবে মনে করেন সৈনিকদের ব্যারাক বা বাসস্থান। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগীয় 'কিলা' বা ফোর্ট বলতে রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে প্রাকার বেষ্টিত সুরক্ষিত স্থানকে বুঝায়। এ দূর্গের ভেতরেই শাসকগণ তাদের পরিবার, পরিজন এবং নিকটতম আত্মীয়দের নিয়ে থাকতেন। আর দূর্গের বাইরে দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে থাকতেন অন্য সমস্ত নাগরিক। নদীর দিক ব্যতীত দূর্গ বা বৃহত্তর শহরের অন্যান্য দিকে পরিখা দ্বারা দ্বিতীয় বেষ্টনী তৈরী করা হতো। গৌড়-লক্ষণাবতীতে এ ধরনের বিভাজন এবং বেষ্টনী আজও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। সুলতানী আমলে বাংলায় বেশ কিছু রাজধানী-শহরের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন গৌড় বা লক্ষণাবতী, পান্ডুয়া বা ফিরূজাবাদ, নদীয়া বা নবদ্বীপ, দেবকোর্ট বা দেওকোর্ট ও সোনারগাঁও ।[২৭]

সুলতানী যুগে *'খিত্তাহ(খিত্তা)'* ও *'কসবাহ'* নামে দুই ধরনের নগর ছিল। দূর্গযুক্ত নগরীকে বলা হতো *'খিত্তাহ(খিত্তা)'* ও দূর্গহীন নগরীকে *'কসবাহ'*এবং সীমান্তরক্ষার ঘাঁটিকে বলা হত 'থানা'।[২৮] মধ্যযুগীয় শাসনতন্ত্র ছিল সামরিক শক্তি নির্ভর। তাই কসবাহ এবং *'খিত্তাহ(খিত্তা)'*কে সামরিক ছাউনির সঙ্গে তুলনা করা যায়। *'খিত্তাহ(খিত্তা)'* স্থায়ী সামরিক ছাউনিকে বলা হত এবং অস্থায়ী সামরিক ছাউনিকে বলা হত *কসবাহ*। বিদেশ থেকে আগত বিজেতাদের নিকট দূর্গ ছিল অপরিহার্য। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে সুলতানী বাংলায় দূর্গ-নগরীর বেশ কিছু সন্ধান পাওয়া যায় যেমন গৌড় বা লক্ষণাবতী, গড় মন্দারন, গড় জড়িপা, গড় একচালা, দেবকোর্ট, ঘোড়াঘাট, মাহিসন্তোষ, মহাস্থানগড়, নারকিলা বা তুঘরিল গড় প্রভৃতি। দূর্গ নগরীর গঠন রীতি ছিল দূর্গ, পরিখা, পরিদর্শক স্তম্ভ ও পণ্য বিক্রয়ের 'কাটরা বাজার'। এ সুরক্ষিত স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে হত নগর বিন্যাস। শাসকরা ভিন্ন স্থানে অবস্থান করলে বহি:শত্রুর আক্রমণের সময় বা অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত অবস্থায় দূর্গ নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করতেন।[২৯]

বাংলার অনেক নগরী সমুদ্র বন্দর বা নদী বন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছে। সমুদ্র বন্দর হিসেবে চট্টগ্রাম এবং নদী বন্দর হিসেবে সোনারগাঁও। নদী বন্দরের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে গৌড় বা লক্ষণাবতী, পান্ডুয়া বা ফিরূজাবাদ, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ নগরগুলো আবার রাজধানী হিসেবে সুপরিচিত। সাতগাঁও কোন সময় কেন্দ্রীয় রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা জানা যায় না। তবে এটি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি সুবৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্রিক শহর ছিল। এ শহরে বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রথমে এসেছে পর্তুগীজগণ এবং পরে ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকগণ। সাতগাঁও অঞ্চলে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্য শহর গড়ে উঠেছিল তা অতি সাম্প্রতিক কালের একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ থেকে জানা যায়।[৩০] সাতগাঁও এক সময় পূর্ব-বাংলার বাণিজ্যিক নগরী ছিল। শহর কেন্দ্রটির অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল চাল ও কাপড় উৎপাদনের উপর। এখানে অনেক ব্যবসায়ী ও ধনী লোকদের বাস ছিল এবং নিকটবর্তী দালালপুরে প্রায় দেড় হাজার তাঁত শিল্পজীবী পরিবার বাস করতেন। কোন কোন সময় দমদমা শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দমদমা খুব সম্ভব সেনা শহর বা ছাউনি। এ সমস্ত শহর সাধারণভাবে ক্যাম্প শহর নামে খ্যাত।[৩১] এ শহরসমূহ যুদ্ধরত সৈনিকদের ক্যাম্প থেকে সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যাম্প পরে আস্তে আস্তে লোকবসতি বাড়তে থাকে, ফলে এ ক্যাম্পগুলোকে ঘিরে ক্যাম্প শহর গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ খলিফাতাবাদ, সোনারগাঁও ও দেবকোটের কথা উল্লেখ করা যায়। অনেক সময় দরগাহ্‌কে কেন্দ্র করেও বাংলার নগর গড়ে উঠেছিল যেমন সিলেটের শাহজালালের দরগাহ, খুলনার বাগেরহাটের খান জাহান আলীর খলিফাতাবাদ। এ শহরগুলো রাবাতের সাথে তুলনা করা যায়। 'রাবাত' মুসলিম বা খ্রিস্টানদের দূর্গ বিশেষ। এ দূর্গ সাধারণত সীমান্ত এলাকায় নির্মাণ করা হতো। এ দূর্গে সুফি-সাধকগণ থাকতেন, তার সাথে শিষ্যবৃন্দ ধর্মকর্ম করতেন, ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ধর্মান্তরিত করতেন এবং প্রয়োজনবোধে সীমান্তরক্ষার জন্য শাসকের আদেশ অনুযায়ী যুদ্ধ করতেন। এ যোদ্ধাদের সাধারণভাবে গাজী বলা হতো। তারা দেশের

Dhaka University Institutional Repository

অনিয়মিত সৈনিক হিসেবে বিবেচিত হতো এবং সীমান্ত থেকে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। বিখ্যাত ওসমানীয় রাষ্ট্র এই ধরনের গাজী রাষ্ট্র। মরক্কোর রাজধানী রাবাত 'রাবাত' জাতীয় দূর্গ থেকেই বর্ধিত হয়েছে বলেই অনুমান করা হয়।[৩২]

মুসলিম বিজয়ের প্রারম্ভিক কাল থেকে বাংলার শাসক ও সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সমস্ত রাজধানী শহর ও বন্দর নগরী গড়ে ওঠেছিল তার অধিকাংশই আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে, সে সব বন্দর ও শহরের নাম সমকালীন ইতিহাস, সাহিত্য, মুদ্রা ও উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়। তাছাড়া বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকেও বেশকিছু নগরের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু সেসব নগরগুলো সনাক্ত করা অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ; যেমন ইবনে বতুতা বলেন যে, "বাংলার সবচেয়ে সুন্দর ও গৌরবময় শহরগুলোর মধ্যে 'হবঙ্ক' অন্যতম।"[৩৩] ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেছেন শহরটি পূর্ববঙ্গের কোথাও অবস্থিত ছিল। কিন্তু কোথায় সঠিক করে বলার উপায় নেই। অবশ্য নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেছেন যে, সিলেট শহরের ৬ মাইল উত্তরে বুরাকক নদী যেখানে সুরমা ও কুশিয়ারা এই দুটি শাখা নদীতে বিভক্ত হয়েছে, তার সংযোগস্থলে 'হবঙ্ক' নামক একটি টিলা পাওয়া যায়। হয়ত সুদূর অতীতে এখানে সমৃদ্ধশালী নগরীর অস্তিত্ব ছিল।

সুলতানী বাংলায় বেশকিছু প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নগর গড়ে উঠেছিল যেমন প্রশাসনিক কেন্দ্র, সূফি-সাধকদের খানকাহ, মসজিদ-মাদ্রাসা, শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র, টাকশাল নগরী প্রভৃতি। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

Dhaka University Institutional Repository

২.২ প্রশাসনিক কেন্দ্র

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরই শাসকগণ বাংলার বিভিন্ন স্থানে রাজধানী শহর, প্রশাসনিক সদর দপ্তর, থানা বা পুলিশ ক্যাম্প এবং সেনানিবাস বা দূর্গ নির্মাণ করেন। বিজয়ী মুসলমানদের সাথে অনেক শিক্ষিত উলেমা, কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও সুফি-সাধক এদেশে আসেন। সুফি-সাধকগণ বিভিন্ন উপশহর কিংবা ধর্মীয় সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু, বৌদ্ধ স্থানগুলোর কাছাকাছি তাদের খানকাহ স্থাপন করতেন। এভাবে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে শাসক শ্রেণীর অভিবাসীর বসতি গড়ে উঠে, যা সময়ের বিবর্তনে ছোট্ট শহরে উপনীত হয়।[৩৪] আঞ্চলিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রকে ভিত্তি করে অনেক নগরকেন্দ্রের উন্মেষ ঘটেছিল। রাজস্ব সংগ্রহকে আরো কার্যকরী করে তুলতে স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলা হয়েছিল। মূলত সুলতানী আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইকলিম, আরসাহ, শহর এবং কস্‌বাহ নিয়ে গঠিত ছিল। মুসলিম শাসনামলে তথা স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলায় নগরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন। তাছাড়া ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে বহির্বিশ্বের সাথে বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়। এতে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হয় অন্যদিকে তেমনি বিদেশী বিজেতাদের নগরে বাস করার স্বাভাবিক প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এরূপ সুস্থ শাসনব্যবস্থার প্রয়োগে নগরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৩৫] তাছাড়া চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে স্বাধীন সুলতানদের শাসনামলে স্থিতিশীল রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নগর বিন্যাস বাড়তে থাকে এর বড় কারণ ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। কারণ এ যুগে বাণিজ্যের পুনজাগরণ ঘটে এবং আরব বণিকদের বাণিজ্যিক প্রতিভা এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বার খুলে যায়। ব্যবসায়-

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্যের পাশাপাশি নতুন নতুন প্রশাসনিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পরে, ফলে নতুন নতুন শহরের পত্তন হয়।[৩৬]

২.৩ সুফি-সাধকদের খানকাহ

নগরায়নের অন্যতম উপাদান সুফি সাধকদের *খানকাহ*। যে সব সুফি সাধকগণ বাংলায় আগমন করেন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আনাচে-কানাচে তাদের *খানকাহ* প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও তারা বিভিন্ন উপশহর কিংবা ধর্মীয় সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু, বৌদ্ধ স্থানগুলোর কাছাকাছি তাদের খানকাহ স্থাপন করেছিলেন। সুফি সাধকদের এসব *খানকাহ*গুলো ছিল শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা, আধ্যাত্মিক, মানবকল্যাণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যাবলির এক একটি প্রধান কেন্দ্র। এসব শিক্ষাকেন্দ্র চতুর্দিক থেকে শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করত। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনকি উত্তর ভারত থেকেও শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হতো।[৩৭] সুফি সাধকদের অনুসারীরা বিভিন্ন প্রদেশের নিভৃততম কোণেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সুফি সাধকদের এসব বসতি স্থাপন নগরকেন্দ্রের সৃষ্টি করেছিল, যেমন সিলেট ও সোনারগাঁ। সোনারগাঁ শুধু প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না সুফি সাধকদের খানকাহর জন্যও বিখ্যাত ছিল। যেমন শেখ শরফউদ্দিন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে *খানকাহ* ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৮]

মূলত *খানকাহ* স্থাপন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ঘটনা, কারণ খানকাহর জন্য বরাদ্দ করা নিষ্কর ভূমি থেকে প্রাপ্ত কৃষিজ উদ্বৃত্ত থেকে *খানকাহ* সংলগ্ন ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় নির্বাহ করা হত। *খানকাহ*গুলোর প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার প্রভাবে অনেকেই সহজে ইসলাম গ্রহণ করত। *খানকাহর* রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রদত্ত ভূ খন্ডে তাদেরকে সুবিধাজনক শর্তে বসবাস করতে

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়া হত। তাছাড়া তৎকালীন সময়ে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের নদীগুলোর আশে পাশে অনবরত নতুন নতুন ভূ খন্ড গঠিত হচ্ছিল। কোন কোন সুফি সাধক বোধ হয় ঐ জেগে উঠা জমিতে স্থনীয় লোকদেরকে বসিয়ে আবাদ করাতেন। এভাবে সমাজ গঠিত হয়েছিল। আর সমাজ গঠনের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে চালু ছিল নগরায়নের প্রক্রিয়া, আর সেই সঙ্গে শুরু হয়েছিল নগরকেন্দ্রের উদ্ভব। এছাড়া দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে চাল ও বস্ত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি ও বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকজনের বিরতিহীন কাজ-কর্মের ফলেই এসেছিল এর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি।[৩৯]

২.৪ মসজিদ ও মাদ্রাসা

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর শাসকগণ বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতিতে এসব মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম। মসজিদকে কেন্দ্র করে আবার বহু মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল। সুলতানও আমির ওমরাহ্ মাদ্রাসা স্থাপন ও এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং প্রচুর দানের ব্যবস্থা করেন। সুফি সাধক, শেখ ও উলেমার ধর্ম প্রচার এবং মাদ্রাসার ও মসজিদের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করে। এসব শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সাধারণ মানুষের যাতায়াত বেড়ে যায়। বস্তুত এসব মসজিদ মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী পর্যায়ে নগরের পত্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ পান্ডুয়া, রংপুর, মান্দারন (বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর) ও সাতগাঁও ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায় যে, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ পান্ডুয়ায় মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন এবং এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিষ্কর জমি দান করেন।[৪০] এছাড়াও হুসেনশাহ ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের দরস্‌বাড়ি অঞ্চলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। দরস্‌বাড়ি শব্দের অর্থ পড়ালেখার

Dhaka University Institutional Repository

ঘর।[৪১] সাতগাঁয়ে সুলতান রুকনউদ্দিন কাইকাউসের সময়ে ১২৯৩ খ্রিস্টাব্দে একটি মাদ্রাসা নির্মিত হয়। তাছাড়া সুলতান শামসুউদ্দিন ফিরোজ শাহের সময়ে ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে সাতগাঁয়ে আরও একটি মাদ্রাসা নির্মিত হয়। এ মাদ্রাসা 'দারুল খায়রাত' (পরোপকারের বাড়ি) নামে অভিহিত ছিল।[৪২] মূলত এ মাদ্রাসা দুটো সাতগাঁও অঞ্চলে ইসলাম বিষয়ক শিক্ষা জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করে। সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (রাজা গনেশের পুত্র যদু (১৪১৫-১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ) পান্ডুয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আবার সুলতান সিকান্দার শাহ ১৩৬৪-১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দে পান্ডুয়ায় আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। মুসলমান আমলে রংপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় সদর দপ্তরই ছিল না, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মাদ বখতিয়ার খলজির সময়ে রংপুরে একটি মাদ্রাসা ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সুলতান বারবাক শাহের রাজত্বকালে (১৪৫৯-১৪৭৪) রংপুরে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে) বাঘায় একটি জামী মসজিদ নির্মাণ করেন। এছাড়া সুলতান হুসেন শাহের সময়ে মান্দারনে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৩] এ সমস্ত মসজিদ ও মাদ্রাসাকে ঘিরে পরবর্তীতে নগরের গোড়াপত্তন ঘটে। মূলত বাংলার নগরায়ন প্রক্রিয়ায় মসজিদ ও মাদ্রাসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

২.৫ শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু শহর গড়ে উঠেছিল। যেমন- তাব্রিজাবাদ (দিনাজপুর), নবদ্বীপ, বিহার শরীফ, সোনারগাঁ ও আজিমাবাদ (পাটনা)। এছাড়া ও মহিসন্তোষ নামে পরিচিত রাজশাহী জেলার অন্তর্গত মহিসুন ছিল মুসলমানদের প্রথম যুগের অন্যতম জ্ঞানকেন্দ্র। এ কেন্দ্রের সুনাম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের আকৃষ্ট করেছিল। মাওলানা তকিউদ্দিন

আরাবী নামে বিখ্যাত পন্ডিত এখানে একটি জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র পরিচালনা করেন। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে মহিসুন উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল।[৪৪]

২.৬ ব্যবসায়-বাণিজ্য

যে কোন রাষ্ট্রের সফলতার সার্থক প্রয়াস হল সেই রাষ্ট্রের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি। তৎকালীন সময়ে বাংলায় কোন মুদ্রার প্রচলন ছিল না এবং বিনিময়ের মাধ্যম ছিল কড়ি। মুসলমান সুলতানদের সফলতায় বাংলায় একটি মানসম্মত মুদ্রার প্রচলন ঘটে। ফলে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং কৃষি নির্ভর অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। বাংলার মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার উল্লেখ করেন যে, মুসলিম শাসনামলে বাংলার নগরায়নের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ব্যাপকহারে ধাতব মুদ্রার প্রচলন ও প্রসারণ। আর এসব ধাতব মুদ্রা শুধু সার্বভৌমত্বের প্রতীকই ছিল না বরং বিনিময়ের উৎকৃষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের পরিচয় বহন করে। ফলে ঐ সময়ে গৌড়, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁ, সাতগাঁ ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি নগর ও বন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[৪৫] তাছাড়া মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে এডওয়ার্ড টমাস (Edward Thomas) বলেছেন যে, ভারতের মুদ্রার ইতিহাসে বাংলার বিশেষ মর্যাদা এই জন্য যে মধ্যযুগে (সুলতানী আমলে) বাংলায় একটি জাতীয় মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।[৪৬] ফলে বাংলার গ্রাম্য অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটেছিল, এবং বহির্বাণিজ্য পুরোদমে শুরু হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে ভৌগোলিক কারণে উত্তর ভারতে সড়ক ব্যবস্থা তেমন সুবিধাজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মকাণ্ড কিছু নির্দিষ্ট শহরেই সীমিত রাখতে হতো। অপরপক্ষে পর্যাপ্ত নদীর দেশ এ বাংলায় শাসনকর্তাগণ সহজলভ্য নৌপথের

Dhaka University Institutional Repository

কারণে প্রয়োজনমত রাজধানী স্থানান্তরিত করতে পারতেন। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি অনুভূত হতো। এছাড়া শাসনকর্তা বা সুলতানগণ নদীপথে ভ্রমণ করার সময় অনেক নতুন শহর পরিদর্শন করতেন এবং সে সমস্ত শহর থেকে প্রায়শ:ই মুদ্রা জারি করতেন।[৪৭] এসব মুদ্রার মাধ্যমেই নতুন নতুন শহরের নাম জানা যায়। আবার অনেক মুদ্রার অস্পষ্টতার কারণে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যেমন সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজির (১২১৩-১২২৭ খ্রিস্টাব্দ) সময়ের কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া যায়। যাতে সাল আছে, কিন্তু কোথাকার টাকশাল থেকে প্রস্তুত তাহার উল্লেখ নাই।[৪৮]

মূলত ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্মৃদ্ধি বাংলার নগরায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বন্দর ও শহরসমূহ যেমন সাতগাঁও, হুগলী, সোনারগাঁ, গৌড়, লখনৌতি, চাটগাঁ (চট্টগ্রাম) ইত্যাদির সঙ্গে দক্ষিণ ভারত, বার্মা, জাভা, সুমাত্রা, চীন এবং অন্যান্য দূর পূর্বাঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। পোশাকশিল্প (মসলিন, রেশম, সুতি) কাগজ, চামড়া, মৎস্য, জাহাজ নির্মাণ, ধাতব শিল্প ইত্যাদি শিল্প-কারখানা এসময় গড়ে উঠতে শুরু করে এবং ব্যবসায়-বাণজ্যের উন্নতি ঘটে যা নগরায়নের গতি সঞ্চারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল ।[৪৯]

২.৭ টাকশাল শহর

বাংলার বিভিন্ন স্থানে টাকশাল স্থাপন করার ফলে বেশ কিছু শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে যখন মুসলমানরা কোন অংশ জয় করতেন তখন তারা ঐ অঞ্চলের নামে স্মারক মুদ্রা প্রণয়ন করতেন এবং টাকশাল নির্মাণ করতেন। মুসলিম শাসকদের অনুসৃত এ নীতির ফলে টাকশাল স্থানটি কালক্রমে একটি শহরে রূপান্তর হয়েছে। এসব টাকশাল নগরী প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক এম. আর. তরফদার বলেন যে, "বেশ কিছু সংখ্যক টাকশাল নগরী প্রমাণ করে যে বাংলার সমুদ্র বাণিজ্যের পুনরায় অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরের সাথে তার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এভাবে মুসলিম শাসকগণ বাংলাকে গ্রাম থেকে শহরমুখী করে তোলে যার ভিত্তি রচিত হয়েছিল অর্থনীতিকে ঘিরে।"[৫০]

বাংলার মুদ্রা বিশেষজ্ঞগণ মুদ্রা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুলতানী যুগে বেশ কিছু টাকশাল নগরীর সন্ধান পান। তবে এর সবগুলোর যে পৃথক সত্তা ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই। কারণ বাংলার সুলতানগণ সময় বিশেষে তাঁদের রাজধানী অথবা টাকশাল শহরের নাম পরিবর্তন করতেন। নাম পরিবর্তনের পেছনে কিছু কারণ থাকতো, যেমন নিজের বা পিতার নামকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উদযাপন করতে গিয়ে অথবা সুলতানদের রাজসিক খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য।[৫১]

সুলতানী আমলে বেশ কিছু টাকশাল নগরী থেকে মুদ্রা প্রণীত হয় : এগুলো হল লখনৌতি(গৌড়), সোনারগাঁও, সাতগাঁও, গিয়াসপুর, ফিরূজাবাদ, শহর-ই-নও, মুয়াজ্জেমাবাদ, সূবর্ণগ্রাম, জান্নাতাবাদ, ফতেহাবাদ, মুহাম্মদাবাদ ও খলিফাতাবাদ ইত্যাদি। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরই শাসকগণ শুধু রাজধানী হতেই নয় অপরাপর প্রশাসনিক এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো হতেও মুদ্রা জারি করেন। মুদ্রাগুলো শুধু সরকারের প্রধান কেন্দ্রগুলোর বিভাজনই দেখায় না, বরং নগর বা শহরগুলোর উত্থান ও পতনকেও নির্দেশ করে। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে টাকশাল শহরের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। উদ্ভবের ক্রমানুযায়ী নিম্নে টাকশালগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল।

(ক) গিয়াসপুর

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর তাঁর নিজ নামে গিয়াসপুর টাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন। ৭২২ হিজরী/ ১৩২২ খ্রিস্টাব্দের মুদ্রার মাধ্যমে এ টাকশালের নাম প্রকাশ পায়। এ মুদ্রার নামের পূর্বে আরসাহ বা শহর শব্দটি সংযোজিত হয়। বর্তমানের ময়মনসিংহ শহর হতে প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ইনায়েতপুরের কাছে একই নামের একটি মৌজার সাথে একে সনাক্ত করা হয়। তবে, শহরটির সনাক্তকরণ নিয়ে ব্লকম্যান বলেন যে গিয়াসপুর সোনারগাঁয়ের প্রতিবেশী অঞ্চল ।[৫২]

(খ) শহর-ই-নও

আব্দুল করিমের মতে, শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে শহর-ই-নও অর্থ নতুন শহর। তিনি আরও বলেন, হিন্দু সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের উপর মুসলমানরা মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল বলে এর নাম হয় শহর-ই-নও এবং এটি পাণ্ডুয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।[৫৩] মূলত এটি সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮) এবং সিকান্দার শাহের একটি টাকশাল শহর। এ টাকশাল থেকে সর্বপ্রথম জারিকৃত মুদ্রার তারিখ ৭৪৬ হি./ ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দ এবং সর্বশেষ জারিকৃত মুদ্রার তারিখ ৭৮৬ হি./ ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দ। এ মুদ্রায় সুলতানের নামের আগে আলবালাদ এবং আরসাহ সংযুক্ত করা হয়েছে। মূলত, এর সঠিক শনাক্তকরণ এখনও বিতর্কিত বিষয়। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার নিকটে অবস্থিত হওয়ায় শহর-ই-নও শুধু উপনগরের মর্যাদা বহন করত এবং এটি টাকশাল শহর হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার মাত্র ৬ বছর পূর্বে হযরত পাণ্ডুয়া রাজধানী শহর আবির্ভূত হয়েছিল। অতএব শহর-ই-নও যা শব্দগত ভাবে নতুন নগর বুঝায়-তা পাণ্ডুয়াকেই নির্দেশ করে।[৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

(গ) মুয়াজ্জেমাবাদ

ব্রহ্মপুত্র নদের বিপরীত তীরে সোনারগাঁ হতে বার মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি পুরাতন গ্রাম মোয়াজ্জেমপুরের সাথে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুলতান সিকান্দর শাহ নগরটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার নিজের 'আল মুয়াজ্জম' উপাধি অনুসারে এর নামকরণ করেন মুয়াজ্জেমাবাদ।[৫৫] তার ৭৬০ হি./১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দের মুদ্রায় সর্বপ্রথম এ টাকশালের নাম উল্লেখ রয়েছে। দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯) একটি টাকশাল শহর হিসেবে এর গুরুত্ব পুনরুজ্জীবিত করেন। এ টাকশাল হতে মুদ্রিত প্রাপ্ত সর্বশেষ মুদ্রাগুলোর তারিখ হচ্ছে ৯০৭ হি. / ১৫০১ খ্রিস্টাব্দ। লক্ষণাবতী রাজধানী পরিবর্তন এবং সোনারগাঁ হতে নতুন নগরে মানুষের ক্রমে অভিবাসনের ফলে এর জনসংখ্যা এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া চুড়ান্ত পর্যায়ে ইকলিম-ই-মুয়াজ্জেমাবাদের সাথে গৌরবজনক উপাধি হযরত জালাল (অর্থাৎ সুলতানের উপস্থিতি বা আসন) সংযুক্ত করা হয়, যা সোনারগাঁয়ের পূর্বেকার পার্থক্যসূচক নাম ছিল।

(ঘ) জান্নাতাবাদ

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মুদ্রায় সর্বপ্রথম ৭৯০ হি./ ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে এবং ৭৯৮/ এবং ১৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে জান্নাতাবাদ টাকশালের নাম পাওয়া যায়।[৫৬] লক্ষণাবতী বা গৌড়কে জান্নাতাবাদ বলে সনাক্ত করা হয়েছে। মো: আখতারুজ্জামানের মতে, জান্নাতাবাদ লক্ষণাবতীতে অবস্থিত।[৫৭] বলা হয়ে থাকে সম্রাট হুমায়ুন লক্ষণাবতী নামকরণ করেন 'বখতাবাদ' যা কখনও পরিবর্তিত হয়ে 'জান্নাতুল বিলাদ' নামে পরিচিত হয়েছে। *আইন-ই-আকবরী*তে আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন, সম্রাট হুমায়ুন লক্ষণাবতী নামকরণ করেন জান্নাতাবাদ।[৫৮] যদিও এ তথ্য নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত সুলতান রুকনউদ্দিন বারবাক শাহের একটি মুদ্রা পাঠ করে ঐতিহাসিক লেনপুল জান্নাতাবাদকে টাকশাল শহর হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। যদিও আব্দুল করিম এ মত ভ্রান্ত বলে দাবী করেন। তবে আমরা মুদ্রা থেকেই নিশ্চিত হতে পারি জান্নাতাবাদ টাকশাল সুলতানী যুগেই প্রচলিত ছিল।

(ঙ) ফতেহাবাদ

Richard M.Eaton বলেন যে ফতেহাবাদ ফরিদপুরের অংশবিশেষ। তবে আধুনিক গবেষকগণ ফতেহাবাদকে ফরিদপুরের সাথে অভিন্ন বলে মন্তব্য করেছেন। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে ফতেহাবাদের সীমারেখা আরও বিস্তৃত বলে বর্ণিত হয়েছে।[৫৯] আবুল ফজল দেখিয়েছেন যে, ৩১ টি মহাল ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহালগুলোর নাম থেকে বোঝা যায়, বর্তমান ফরিদপুর জেলার কিছুটা অঞ্চল নিয়ে সরকারটি গঠিত হয়েছিল। জালালুদ্দীন ফতেহশাহের মুদ্রায় সর্বপ্রথম ফতেহাবাদের নাম পাওয়া যায়। তাই মনে করা হয় তিনিই টাকশালের স্থপতি।[৬০] অবশ্য এ মতের বিরোধীতা করে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বলেন যে, জালালুদ্দীনের মুদ্রা স্পষ্ট নয়। এ কারণে তিনি মনে করেন জালাল উদ্দীন মাহমুদ শাহের নামানুসারে ফতেহাবাদ নাম হয়েছে।[৬১] মুদ্রা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, জালাল উদ্দীন মাহমুদ শাহের পর থেকে সমগ্র স্বাধীন সুলতানী যুগের সময়ব্যাপী 'ফতেহাবাদ' টাকশাল শহর হিসাবে পরিচিত হয়।[৬২]

(চ) রোটাসপুর

জালালউদ্দীন মাহমুদ শাহের একটি মুদ্রায় রোটাসপুর টাকশালের উদ্বৃতি রয়েছে। ৮২৭ হি. /১৪২০ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ এ মুদ্রাই রোটাসপুর টাকশালের একমাত্র সাক্ষী।[৬৩] রোটাসপুরের অবস্থান নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায়নি :

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র বিহারের রোটাসগড়ের সঙ্গে এর ধ্বনিতাত্ত্বিক মিল রয়েছে। কিন্তু জালাল উদ্দিন মাহমুদ শাহ রোটাসগড়ের মতো সুদূর পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। মূলত, তথ্যাদির স্বল্পতার কারণে এর সঠিক সনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি।

(ছ) মাহমুদাবাদ

মাহমুদাবাদ টাকশাল শহরের অবস্থান বিতর্কিত। ব্লখম্যানের মতে, মাহমুদাবাদ মুয়াজ্জমাবাদের-ই নামান্তর। তবে অনেকেই ধারণা করেন মাহমুদ শাহ গৌড়কে নিজের নামানুসারে মাহমুদাবাদ নামকরণ করেন।[৬৪] মূলত সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৩৬-১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ) এর নামানুসারেই এ টাকশালের নামকরণ হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। সুলতান ৮৫৮ হি./ ১৪৫৪ খ্রিস্টাব্দে এ টাকশাল হতে মুদ্রা জারি করেন। পরবর্তী সুলতানদের মুদ্রায় এ টাকশালের নাম পাওয়া যায় না। তবে সুলতান সাইফুদ্দিন ফিরুজশাহ (১৪৮২-১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ) এবং নাসিরউদ্দীন নুসরাত শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ) এর মুদ্রায় মাহমুদাবাদ টাকশালের নাম পুনরায় দেখা যায়। শহরটির সনাক্তকরণ এখনও সন্দেহজনক। তবে Richard M.Eaton মাহমুদাবাদকে আধুনিক যশোর জেলার অংশবিশেষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আইন-ই-আকবরীর তথ্য থেকে সরকার মাহমুদাবাদের অন্তর্গত মহল মাহমুদাবাদের সাথে সনাক্ত করা যেতে পারে। সরকার মাহমুদাবাদ উত্তর-পূর্ব নদীয়া, উত্তর-পূর্ব যশোর এবং ফরিদপুরের পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল।[৬৫]

(জ) বারবকাবাদ

সুলতানী যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ টাকশাল শহর হলো বারবকাবাদ। এর অবস্থান বর্তমান দিনাজপুর জেলার মহিসন্তোষ অঞ্চলে। সুলতান রুকনুদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪) এই টাকশাল শহরের পত্তন করেন। এ টাকশালে প্রাপ্ত আদি মুদ্রার তারিখ হচ্ছে ৮৬৪হি./ ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ । বারবক শাহের মুদ্রা ছাড়াও এ টাকশাল থেকে সুলতান শামসউদ্দিন মুজাফফর শাহ ও সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ মুদ্রা জারি করেন। বারবক শাহের নামাঙ্কিত প্রাপ্ত মুদ্রার সর্বশেষ তাবিখ ৯২৮হি./ ১৫২১ খ্রিস্টাব্দ।[৬৬]

(ঝ) মুহম্মদাবাদ

জালালউদ্দনি ফতেহশাহের মুদ্রায় প্রথম মুহম্মদাবাদ টাকশালের নাম পাওয়া যায়। যদিও প্রথম মুদ্রার তারিখ অসম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা হয়েছে ৮৮হি.। ফতেহ শাহ ছাড়াও আলাউদ্দিন হুসেন শাহ এবং নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহের মুদ্রায় ও মুহম্মদাবাদ টাকশালের প্রমাণ রয়েছে।[৬৭] মূলত, হোসেনশাহী বংশের সকল সুলতানের আমলেই টাকশাল শহর হিসেবে এটি চালু ছিল। এ টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ সর্বশেষ মুদ্রার তারিখ ৯৩৪ হি./ ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ। আব্দুল করিম মনে করেন যে, সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহের নামানুসারে হয়ত মুহাম্মদাবাদ নাম হয়েছে।[৬৮]

(ঞ) হুসাইনাবাদ

হুসেনশাহী বংশের শাসনকালে হুসাইনাবাদ টাকশাল শহরের নাম পাওয়া যায়। এ.এইচ. দানীর উদ্বৃতি ও শিলালিপির সাক্ষ্যে তিনটি হুসাইনাবাদের নাম পাওয়া যায়। এর একটি চব্বিশ পরগনায়, দ্বিতীয়টি মুর্শিদাবাদে এবং তৃতীয়টি লক্ষণাবতীর নিকটে মালদাহ জেলায়।[৬৯] আব্দুল করিম ধারণা করেছেন যে, হুসাইনাবাদ টাকশাল লক্ষণাবতী নিকটবর্তী হওয়ার যৌক্তিকতা বেশী। হুসাইনাবাদ টাকশালটি সুলতান হোসেনশাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তার নামে টাকশালটির নামকরণ করা হয়েছিল। হুসাইন শাহের ক্ষমতা গ্রহণের বছরেই

Dhaka University Institutional Repository

৮৯৯হি./ ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ এ টাকশাল থেকে মুদ্রা জারি হয়। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শহরটি একটি টাকশাল শহর হিসেবে মর্যাদা ভোগ করেছে।[৭০]

(ট) চন্দ্রবাদ

নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে, হুসেনশাহের প্রথম জীবনের স্মৃতি বিজড়িত মুর্শিদাবাদ জেলার চাঁদপুর বা চাঁদপাড়ারই নামান্তর এই চন্দ্রাবাদ। মূলত টাকশালটি হুসেনশাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ চন্দ্রাবাদ স্থানের সাথে প্রথম জীবনে হোসেন শাহের সম্পর্ক ছিল।[৭১]

(ঠ) নুসরাতাবাদ

এ.বি.এম হাবিবুল্লাহ বলেন যে, "এই টাকশাল শহরের নামকরণ সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের নামে করা হয়েছে। টাকশালটি সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার নামেই টাকশালটির নামকরণ করা হয়েছিল। সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের ৮৬১ হি./ ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দের একটি মুদ্রায় এ টাকশালটি প্রথম আবির্ভূত হয়। এছাড়াও সুলতান আলাউদ্দিন ফিরুজশাহ এবং গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের মুদ্রায় নুসরাতাবাদ টাকশালের সন্ধান পাওয়া যায়। এ টাকশালের সর্বশেষ মুদ্রার তারিখ ৯৩৩হি./ ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ । দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গড়ে ওঠা সরকার ঘোড়াঘাট অঞ্চলটি নূসরাতাবাদ বলে শনাক্ত করা হয়েছে।[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

(ড) খলিফাতাবাদ

আধুনিক বাগেরহাট জেলায় খলিফাতাবাদ টাকশালের অবস্থান ছিল।[৭৩] এ অঞ্চলটি মুসলিম অধিকারভুক্ত হয় সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সময় (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর সেনাপতি খান-ই-জাহানের নেতৃত্বেই এখানে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের মুদ্রায় টাকশাল শহর হিসাবে সর্বপ্রথম খলিফাতাবাদের নাম পাওয়া যায়। মূলত, তার পিতার জীবদ্দশায়ই নুসরাত শাহ নিজ নামে মুদ্রা জারি করার বিশেষ অধিকার ভোগ করেছিলেন। এছাড়া সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালেও এটি টাকশাল শহরের মর্যাদা ভোগ করেছিল। এ টাকশাল হতে জারীকৃত তাঁর সর্বশেষ মুদ্রার তারিখ ৯৪২হি. / ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দ ।

(ঢ) খলিফাতাবাদ বদরপুর

বাগেরহাটের নিকটের একটি উপ-শহর খালিফাতাবাদ বদরপুর। যদিও বর্তমানে এটি বিলীন হয়ে গেছে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের মুদ্রায় খলিফাতাবাদ বদরপুর নাম লেখা রয়েছে। এ মুদ্রার সময় তারিখ ৯৪১হি./ ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দ। সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ আবদুল বদর নামে পরিচিত ছিলেন।[৭৪] তাঁর মুদ্রার উভয় পিঠেই উপাধি লিখতে গিয়ে শাহী বদর উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত সুলতান তার নিজের নাম আবদ-আল-বদর অনুযায়ী বিদ্যমান খলিফাতাবাদের নামের সাথে শুধু বদর শব্দটি যোগ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, হয়তো নিজের নামকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি খলিফাতাবাদের সঙ্গে বদরপুর যুক্ত করেছেন।[৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

(ণ) শরীফাবাদ

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের প্রত্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিমে সমুদ্র হতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত শরীফাবাদ।[৭৬] শেরশাহ এবং ইসলাম শাহ (১৫৪৫-১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দ) এটিকে টাকশাল শহর হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁদের সর্বপ্রথম মুদ্রার তারিখ হচ্ছে ৯৮৬হি./ ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দ এবং সর্বশেষ মুদ্রার তারিখ ৯৫৩ হি./ ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দ ।

বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পর সুলতানগণ বিভিন্ন স্থানে টাকশাল শহর স্থাপন করেন যা নগরায়নকে ত্বরান্বিত করেছিল। কারণ মুসলমানদের আগমনের পর মুদ্রার প্রচলন বাণিজ্যকে আরো বেশী প্রসারিত করেছিল এবং গ্রাম্য অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটেছিল যা নগরায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের আগমনের পর নগরায়নের যে ধারা সূচিত হয়েছিল এবং পরবর্তী যেসব নগরের পত্তন ঘটেছিল তা সুলতানী আমলের নগরায়নকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। মূলত বাংলার সুলতানদের সফলতাই নগরায়নের এ প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রেখেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, সুলতানী আমল, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮০

২. সুশীলা মন্ডল, *বঙ্গদেশের ইতিহাস*, মধ্যযুগ, প্রথম পর্ব, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৭৬

৩. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৭

৪. ঐ

৫. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস* (বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব), ঢাকা, ২০০৫, পৃ.০৫, আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

৬. Jadu-nath Sarkar, *The History of Bengal,* vol. 2, Muslim Period (1200-1757), Dacca, 1972, p. 4 ; আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

৭. সুশীলা মন্ডল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭ ; আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

৮. Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, 2009, pp. 1-2; Khondkar Fuzli Rubbee, *The Origin of the Musalmans of Bengal,* Calcutta, 1895, p. 07; ডক্টর সুশীলা মন্ডল, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৭

৯. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৯; আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

১০. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৬

১১. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০; গোলাম হুসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৫৬

১২. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০; সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৭ ; আব্দুল করিম , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

১৩. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

১৪. Jadu-nath Sarkar, *op.cit* , p. 6

Dhaka University Institutional Repository

১৫. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০; সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

১৬. মিনহাজ-ই-সিরাজ , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮ ; সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮; আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০১

১৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খন্ড (মধ্যযুগ), কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ০৫; মিনহাজ-ই-সিরাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

১৮. Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh. 2009, p. 58. জিয়াউদ্দীন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, গোলাম সামদানী কোরায়শী অনুদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৬৫

১৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪ ; জিয়াউদ্দীন বারানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

২০. Ibn Battuta, *The Rehla of Ibn Battuta*, (eng.tr.) Agha Mahdi Hussain; Baroda, 1976, p.237; নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম*, অনুবাদ, মো: রেজাউল করিম, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১০৭

২১. Shams-i-Siraj Afif, *Tarikh- i -Firuz Shahi,* Eliot and Dowson, (ed) *Hostory of India*, voll.111, Allahabad, p. 296; আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯

২২. মো: আখতারুজ্জামান,"মধ্যযুগ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি", *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*-৩, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৪০-৪৩

২৩. রীনা ভাদুড়ী, মুসলিম শাসনের প্রারম্ভে ও সুলতানী আমলে বাংলার নগর বিন্যাস, *ইতিহাস অনুসন্ধান* (৩) কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৬ , পৃ. ৩৯

২৪. Shams-I-Siraj Afif , *op.cit,* p. 296 ; আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮-১৯৯

২৫. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, কলকাতা, ১৯৪০, পৃ. ১

২৬. জিয়াউদ্দিন বারানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

২৭. আশিয়ারা খাতুন, "সুলতানী আমলে বাংলার নগর, প্রকৃতি ও প্রকারভেদ", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ত্রিশবর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৪০৩, পৃ. ২৫

২৮. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), ঢাকা, ১৯৮৭, ৪০৪; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৫-৭৬

২৯. আশিয়ারা খাতুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

৩০. Anil Kumar Das, *Urbanization in Mughal Bengal in the Seventecnth Century.* (Ph.D thesis) Jadavpur University. Map No-1

৩১. *Encyclopedia of Islam,* London, 1960, p. 860.

৩২. আশিয়ারা খাতুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

৩৩. রীনা ভাদুড়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৩ ; নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১-১১২

৩৪. মোঃ আখতারুজ্জামান, নগরায়ন মধ্যযুগ ও ওপনিবেশিক পর্ব, ২০০৭, পৃ. ১

৩৫. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর*, স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮- ১৫৩৮), ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৪৬৯

৩৬. মোঃ আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৩৭. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* vol.1, (1203-1576), Karachi, 1963, p.125

৩৮. Ibid

৩৯. Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, 2009, p. 67. মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৬২

৪০. খান-সাহেব আবিদ আলী খান, *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি*, চৌধুরী শামসুর রহমান সম্পাদিত, ঢাকা , ১৯৮৫, পৃ.২৬

৪১. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৪২. ঐ

৪৩. Muhammad Abdur Rahim, *op.cit*, p.186

৪৪. Ibid

৪৫. Momtazur Rahman Tarafdar, *Husain Shahi Bengal* (A Socio-Political Study) Dhaka, 1965, p. 29

৪৬. Edaward Thomas, *The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi*, p. 147

৪৭. M. Mir Jahan; "*Mint Towns of Medival Bengal*" *Proceeding*, of the Pakistan Historical Conference, Pakistan Historical Society. 1953, p. 225

৪৮. Sir Jadu-nath Sarkar, *op.cit*, p. 29

৪৯. মোঃ আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৫০. Momtazur Rahman Tarafdar, *op.cit*, p. 29

৫১. এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ, "প্রাথমিক সূত্রে সুলতানী বাংলায় নগরের ক্রমবিকাশ", *The Jahangir Nagar Review*, part c,vol xi&xii, 1990-2000& 2000-2001, p.164

৫২. A .Cunningham , *Archeaological Survey Report*, vol.xv.1964, p. 80; Richard M.Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, 1204-1760, London, 1994, p.318

৫৩. Abdul Karim, *Corpus of the Muslim coins in Bengal*, Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1960, p.160

৫৪. মোঃ আখতারুজ্জামান, 'টাকশাল' (মধ্যযুগীয়), *বাংলা পিডিয়া*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), ৭ম খন্ড, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১১৩

৫৫. Abdul Karim, *op.cit*, 160; Richard M.Eaton, *op.cit.p.* 318

৫৬. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. মো: আখতারুজ্জামান, নগরায়ন; মধ্যযুগ ও ওপনিবেশিক পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৫৮. আবুল ফজল আল্লামী, *আইন-ই-আকবরী*, প্রথমও দ্বিতীয় খন্ড, অনুবাদ, আহমেদ ফজলুর রহমান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৩

৫৯. ঐ

৬০. আনন্দনাথ রায়, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৩১৬ বাংলা, পৃ. ২০

৬১. বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, ফতেয়াবাদ, *সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা*, সংখ্যা- ৪০, ১৩৪০ বাংলা, পৃ. ১০৭

৬২. আবদুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৪২

৬৩. Abdul Karim, *op.cit*, p. 162

৬৪. Ibid

৬৫. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

৬৬. Abdul Karim, *op.cit*, p.163; Richard M.Eaton, *op.cit,* p. 318

৬৭. মো: আখতারুজ্জামান, নগরায়ন মধ্যযুগ ও ওপনিবেশিক পর্ব , পৃ. ২

৬৮. Abdul Karim, *op.cit,* p.163

৬৯. Ahmad Hasan Dani, *Bibliography of the Muslim Inscription of Bengal,* Dacca, Asp, 1957, pp. 109-110

৭০. Abdul Karim, *op.cit*, p. 164

৭১. মো: আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩; Richard M.Eaton, *op.cit,* p.318

৭২. এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, ঢাকা, ১৯৯৯ , পৃ. ১৮

৭৩. মো: আখতারুজ্জামান, 'টাকশাল' (মধ্যযুগীয়), বাংলা পিডিয়া, ৭ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৭৪. A.B.M. Habibullah, *History of Bengal*, vol.11. ed. Jadu-nath Sarkar. p. 123

৭৫. *বাংলা পিডিয়া*, ৭ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৭৬. মো: আখতারুজ্জামান, নগরায়ন: মধ্যযুগ ও ওপনিবেশিক পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ.৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সুলতানী আমলে বাংলার নগর ও বন্দর

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে নদীয়া জয় করেন এবং গৌড়ে মুসলিম রাজত্বের সূচনা করেন।[১] তার এ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বহিরাগত মুসলমানদের আগমনের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ এদেশে শাসনকর্তা, সেনাপতি, ধর্মপ্রচারক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও ভাগ্যান্বেষণকারীরূপে আগমন করেন। এ বহিরাগতদের মধ্যে আরব মুসলমানও আগমন করেন। আরব বহিরাগতদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সুফি, ধর্ম-প্রচারক ও বণিক সম্প্রদায়। সুফিগণ তাদের শিষ্যসহ বাংলায় আগমন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে *খানকাহ* স্থাপন করেন।[২] *খানকাহ*-তে শিষ্যদের আসা যাওয়ার মাধ্যমে এসব জায়গা জমজমাট হয়ে ওঠে এবং জনবসতি বাড়তে থাকে, ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পত্তন ঘটে। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী উল্লেখ করেন যে, সুলতানরা শিক্ষিত, ভদ্র, বণিকদেরকে শহরে বাস করার জন্য অভ্যস্ত করত।[৩] বাংলার বহিরাগত মুসলমানগণ তাদের নিজস্ব প্রয়োজনেই বাণিজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল কারণ বিদেশীদের রুচি, খাওয়া-দাওয়া, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা ছিল ভিন্ন যা বাংলায় প্রচলিত ছিল না। তাই তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিদেশ থেকে আমদানী করতে হতো, ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনঃজাগরণ বাংলার নগরায়নের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ইবনে বখতিয়ার খলজি নদীয়া বিজয় করে লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং এ রাজ্যকে কতকগুলো প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। এ

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলগুলোকে *'ইক্‌তা'* বলা হত এবং এক একজন আমির এক একটি *'ইক্‌তা'*র *'মুকতা'* বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। তৎকালীন সময়ে রাজ্যটি লখনৌতি নামে পরিচিত ছিল। উল্লেখ্য যে ইবনে বখতিয়ার খলজি নিজেই একজন *'মুকতা'* (ভিউলি ও ভাগত পরগণার) ছিলেন।[৪] মূলত, মুসলমানদের আগমনের পর বাংলায় *'ইক্‌তা'* প্রথা শুরু হয় যা ছিল শহরভিত্তিক। ইক্‌তার মুখ্য কেন্দ্রগুলোই প্রধান শহর হিসেবে ওইসব অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করে এবং শহরগুলো আশেপাশের গ্রামগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। শহরগুলো গড়ে উঠলে শহরও গ্রাম অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের সূত্রপাত ঘটে। তাছাড়া মুসলিম শাসক এবং তাদের সঙ্গীদের জন্য কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল। তাদের এ কুটির শিল্পজাতদ্রব্য ও বিলাসদ্রব্যের চাহিদা ক্রমেই বাড়তে থাকে ফলে শিল্প-কারখানার সংখ্যাও বেড়ে যায়। এ ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণকল্পে ছোট ছোট শহরগুলোতে সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগে যা পরবর্তীতে নগরায়নের পথকে প্রশস্ত করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে বাংলায় নগরায়নের এক নতুন বিপ্লব শুরু হয়ে যায়।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পর হতে মুসলিম শাসকরা সেখানে রাজধানী শহর, প্রশাসনিক ভবন, পুলিশ ক্যাম্প, মিলিটারি গ্যারিসন বা থানা গড়ে তোলেন। এসব প্রতিষ্ঠান নগরায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করেছিল। সুলতানী আমলের নগরায়ন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এভাবে বাংলার চারটি শহরে বসতি স্থাপন (লখনৌতি, দেওকোট, সোনারগাঁ, পান্ডুয়া) রাজধানীতে পরিণত হয়। যা পরবর্তীতে প্রধান শহর ও নগর হিসেবে আবির্ভূত হয়।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসকগণ বিভিন্ন স্থানে যে সব সেনানিবাস, থানা, পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করেন সে সব থানা মূলত ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তা দিত এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখত। এসব থানাকে ঘিরে পরবর্তীতে শহর সৃষ্টি হয়। আব্বাস শেরওয়ানী উল্লেখ করেন যে, অডিটপোস্টের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল শাহানা উপাধিধারী এক কর্মকর্তার উপর যাকে নগদ বেতনের পরিবর্তে জমি দেয়া হয়েছিল। রাজস্ব সংগ্রহকে আরো কার্যকরী করে তুলতে স্থানীয় প্রশাসনিক স্থাপনাদি গড়ে তোলা হয়েছিল। এ সময়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা *ইকলিম*, *আরসাহ*, *শহর* এবং *কসবা* নিয়ে গঠিত ছিল। এসব ছোট ছোট অফিসকে ঘিরে কলোনি গড়ে উঠে যা বড় শহর তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৬] সুলতানী আমলে বাংলার উল্লেখযোগ্য নগর, শহর ও বন্দরের উত্থান, বিকাশ ও পতনের ইতিহাস নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। নগরের ইতিহাস বাংলার নগরায়নের প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে ধারণা দিতে সহায়ক হবে।

১. নদীয়া

ভাগীরথী ও জালিংগি নদীর মিলনস্থলে নদীয়া অবস্থিত। পন্ডিতদের ধারণা রাজা লক্ষ্মণসেন ১০৬৩ খ্রিস্টাব্দে শহরটির গোড়াপত্তন করেন। নদীয়া ছিল তাঁর রাজধানী শহর। তাঁর নির্মিত প্রাসাদের একটি ধ্বংসাবশেষ এখনো টিকে আছে। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বিজয়ের মধ্য দিয়েই নদীয়া ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শহরটিতে সংস্কৃত ও ধর্মীয় শিক্ষায় স্বনামধন্য ব্রাহ্মণ ও পন্ডিতের বাস ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় পরে শহরটি ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ষোড়শ শতকের দিকে শ্রী চৈতন্যদেব শহরটিকে আরো প্রসিদ্ধ করেন।[৭] নবদ্বীপেই শ্রী চৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৮) জন্মলাভ করেছিলেন। তাছাড়া নবদ্বীপ হিন্দুদের সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

তীর্থকেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের লেখক বৃন্দাবন দাস তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'চৈতন্য ভগবৎ আদিপর্ব'-এ উল্লেখ করেন যে,

"নবদ্বীপে হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নঞি।
যাই অবতীন হৈলা চৈতন্য গোসাঞি
নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বনিকরে পারে?
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে
ত্রিবিধ বইসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ
স্বরসতী প্রসাদে সবেই মহা দক্ষ
নানাদেশে হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।"[৮]

বলা নিষ্প্রোয়োজন যে বড় শহর হিসেবে নদীয়ায় বণিকদেরও আনাগোনা বেশী ছিল। নদীয়া শুধু রাজধানী শহর হিসেবে নয় বরং, এটি বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র ও ছিল। মুঘল শাসনামলে এটি সরকারের একটি সদর দপ্তর ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে নদীয়া রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা শহরে পরিণত হয়। আর এ সময় থেকে নদীয়া শহরের অবক্ষয় শুরু হয়।

২. লক্ষণাবতী/ লখনৌতি

বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত মালদহ জেলার গঙ্গা নদীর একটি পরিত্যক্ত ধারার সন্নিকটে (২৪°৫৩ উত্তর অক্ষাংশ, ৮৮°১৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) অবস্থিত প্রাচীন লক্ষণাবতী মুসলিম শাসনামলে লখনৌতি নামে পরিচিত ছিল। এ নগরী মুসলমানদের সর্বপ্রথম রাজধানী। প্রাক-মুসলিম যুগের রামাবতী ও লক্ষণাবতী নামে পরিচিত এ নগরী সম্ভবতঃ পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের অন্যতম রাজধানী ছিল।[৯] কিন্তু ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক (রাঢ় ও বরেন্দ্র) বিজিত হওয়ার পূর্বে এর কোনরূপ

লিখিত ইতিহাসের সূচনা হয়নি।[১০] সম্ভবত, সেনবংশীয় সর্বশেষ রাজা লক্ষ্মণসেন নিজের নামানুসারে এ নগরীর নামকরণ করেন লক্ষণাবতী। বাংলা মুসলিম শাসনকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নামটি সংক্ষিপ্ত হয়ে লখনৌতি নামে পরিচিত হয়। মুসলিম রাজধানী লখনৌতি পূর্ববতী হিন্দু রাজধানী থেকে কিছুটা সরে নতুনভাবে গড়ে উঠেছিল।[১১] প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহাম গৌড় শহরের উত্তরে পুরানো শহর লক্ষণাবতীর স্থান নির্ণয় করেছেন।[১২]

সুলতানী আমলে দুটি পর্যায়ে প্রায় আড়াইশ বছর এখানে রাজধানী ছিল। প্রথম পর্যায়ে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। [১৩] দুটি পর্যায়েই লখনৌতি প্রাকৃতিক ও কৌশলগত অবস্থান দখল করেছিল। যার পশ্চিমদিকে গঙ্গা এবং দক্ষিণ দিকে গঙ্গার শাখানদী ভাগীরথীর প্রবাহ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। আর উত্তর পূর্ব দিকে ছিল জলভুমি দূর্গপ্রাচীর। উত্তরদিকে প্রায় সাড়ে ১২ মাইল দীর্ঘ আর পূর্ব দিকে প্রায় ২ মাইল চওড়া আয়তন বিশিষ্ট নগরীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধির সময় জনসংখ্যা ১২ লক্ষ ছিল বলে ফারিসওয়াই সওজা ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ব ভারতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত টাকশাল শহর ছিল লখনৌতিতে। পনের শতক থেকে বিভিন্ন উৎসে এ শহরের আর উল্লেখ পাওয়া যায় না। এটিকে তখন প্রাচীন গৌড় শহরটির সঙ্গে একত্রিত করা হয় যার ধ্বংসাবশেষ মালদহ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে পরগনার সদর দপ্তর হিসেবে এটি ব্যবহৃত হতে থাকে সম্ভবত গঙ্গার পরিবর্তন প্রবাহ লখনৌতির অবস্থানান্তর ঘটায়।[১৪] প্রশাসনিক এবং সামরিক কেন্দ্র ছাড়াও শহরটি বাণিজ্যিক নগর হিসাবে বিকাশ লাভ করেছিল। সাগরদিঘীর উত্তরদিকের উচ্চভূমি এলাকাটি হয়ত প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। যেসব স্থানে মালবাহী নৌকা বা জাহাজ থেকে পণ্যাদি খালাস করা

Dhaka University Institutional Repository

হত, সেসব স্থান এখনো চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। সাগরদিঘীর উত্তর পূর্ব কোণে পীরানো পীর যাওয়ার মধ্যপথে নির্মিত একটি প্রাচীন সেতু এ ইঙ্গিত দেয় যে, এ পথে ছোট ছোট নৌকা দ্বারা মালামাল নগরের অভ্যন্তরভাগে নিয়ে যাওয়া হত। এছাড়া ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ডি ব্যারোস বাণিজ্য স্থান হিসেবে গৌড়ের এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন: "রাস্তাগুলো বেশ প্রশস্ত ও সোজা এবং বড় বড় রাস্তার উভয়পার্শ্বে বৃক্ষরাজি রোপন করে পথচারীদের ছায়াদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নগরীর একটি বিরাট অংশ জুড়ে বড় বড় রাজকীয় ও সুষম ইমারতরাজি রয়েছে।"[১৫]

মুঘল সম্রাটদের রাজত্বকালে লখনৌতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়।[১৬] জিয়াউদ্দিন বারানীর তথ্যানুযায়ী শহরটিতে ২ মাইল দীর্ঘ একটি বাজার ছিল। এর মূল সড়ক ছিল উত্তর অভিমুখী চওড়া এবং সোজাসুজি। বাজারের দোকানগুলো সারিবদ্ধভাবে সুসজ্জিত থাকত। ধারনা করা হয় উত্তর শহরতলীর ফুলওয়ারীতে বল্লালবাড়ির পুরানো প্রাসাদগুলো ছাড়াও নগরীর দক্ষিণ শহরতলীর পাটালজঙীতে একটা নতুন প্রাসাদ ছিল। আলেকজান্ডার কানিংহামের জরিপ থেকে জানা যায় যে, "মধ্যযুগীয় লখনৌতি গৌড়ের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল এবং দৈর্ঘ্য ছিল ৪ মাইল প্রস্তে ১০ মাইল। বর্তমানে এটি দূর্গ, পুকুর ও রাস্তার ধ্বংসাবশেষসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুপরিচিত একটি *গ্রামরূপে* বিদ্যমান।"[১৭]

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন শেরশাহের মোকাবেলা করতে এসে গৌড় দখল করেন এবং এর ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলাকে জান্নাতাবাদ উপাধি দেন।[১৮] সম্রাট এখান থেকে রাজকীয় মুদ্রাঙ্কন করেন এবং ৩ মাস এখানে অবস্থান করেন এবং এর বিপুল ঐশ্বর্যকে উপভোগ করেন।[১৯] বলা হয়ে থাকে যে, হুমায়ুনের প্রশংসামূলক উপাধি গৌড়ের জন্য অভিশাপ নিয়ে এসেছিল। এরপর থেকে গৌড়ের অবক্ষয়

সূচিত হয়। পরবর্তী ৭০ বছরের ইতিহাস যুদ্ধ বিগ্রহের। আফগান, মুঘল শাসক এবং উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যে বাংলার আধিপত্য নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকে।[২০] এ নগরীর প্রাচীন কীর্তিরাজির মধ্যে রয়েছে বড় সোনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, হোসেন শাহের সমাধি, গৌড়ের দূর্গ সাগরদিঘী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩. দেবকোট/দেবিকোট

দেবকোট ছিল এয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার সুপরিচিত শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন নগরী "বন নগরের" (বনগড়) সাথে এটি সনাক্তকৃত। এটি পূর্নভবা নদীর বামতীরে অবস্থিত প্রায় ২ মাইল দীর্ঘ। পন্ডিতদের ধারণা, বিষ্ণুপুরাণে সোনিতাপুর হিসেবে উল্লেখিত এটিই সে শহর যা ইবনে বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে তথাকথিত তিব্বত অভিযানের সময় বনগড়ের পুরানো দেবকোটের প্রাসাদটি প্রশাসনিক দপ্তর হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ১২১১ খ্রিস্টাব্দে ইওয়াজ খলজির রাজধানী স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত এটি মুসলিম রাজধানী হিসাবে পরিগণিত ছিল।[২১] দেবকোট দূর্গে প্রশাসনিক দপ্তর ও বসতি স্থাপনে এটি শীঘ্রই নগরকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বাংলার শাসকগণ এখানে বৃহদায়তনের নির্মাণ কাজ সাধিত করেছিলেন। রাজধানী স্থানান্তর ও মুসলিম শাসকদের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বদিকে বিজয়াভিযান বৃদ্ধির ফলে শহরটি অবক্ষয়ের শিকার হয়। [২২]

৪. গৌড়

গঙ্গার পশ্চিম শাখা কালিন্দি নদীর পূর্বতীরে আধুনিক মালদহ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মধ্যবর্তী স্থানে মধ্যযুগীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় শহরগুলোর একটি ছিল গৌড়। পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে শহরটি বাংলার রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। শহরটির উদ্ভব ঘটেছিল প্রাচীন আমলে। লখনৌতি শহরটি এর মধ্যে অবস্থিত ছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, গৌড় নাম

Dhaka University Institutional Repository

গুড় থেকে এসেছে কারণ বাংলায় খুব আখের চাষ হত। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে দেখা যায়, বরেন্দ্রীয় সৌন্দর্য বাড়িয়েছিল সেখানকার আখের ক্ষেত।[২৩] অধ্যাপক ডি.সি সরকার বিশ্বাস করতেন রামাবতী শহর যার বর্ণনা সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখায় পাওয়া যায়, সেটি গৌড় শহরের কাছেই ছিল।[২৪] ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ শাহ পান্ডুয়া থেকে রাজধানী স্থানান্তর করায় শহরটির গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারপর থেকে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড় রাজধানীর গৌরবে অলংকৃত ছিল। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের বারবার আক্রমণের ফলে সোলায়মান কাররানী পশ্চিম দিকে তান্ডায় রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। মুঘল সেনাপতি মুনিম খান ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

১৫২১ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ দোভাষীর (নাম না জানা) বর্ণনায় গৌড় শহরের উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন যে, "এটি একটি জনাকীর্ণ শহর এবং লোকের ভিড়ে পথচলা মুশকিল। তিনি দেখেছেন যে, অভিজাতরা যখন পালকিতে চড়ে দরবারে যাচ্ছে তখন সামনে তাদের লোকেরা লাঠি দিয়ে লোক সরাচ্ছে। শহরটির আয়তন ২০ মাইল লম্বা এবং ৪ মাইল চওড়া, তন্মধ্যে রয়েছে রাস্তাঘাট, খাল-প্রাসাদ এলাকা ও মসজিদ। তিনি গৌড় শহরের ইটে বাঁধানো পথঘাট দেখেছেন অনেকটা লিসবন শহরের মত।"[২৫] উল্লেখ্য যে, নগরটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এর খালগুলো। এ খালগুলোতে নৌকা চলাচল করত। মনে হয় গঙ্গার উপর মালবোঝাই নৌকা এলে সেই মাল ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অন্য ছোট নৌকা করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া হত অথবা খালের মধ্য দিয়ে কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে নেওয়া হত । এ যাবৎকাল পর্যন্ত এ ধরণের কোন বন্দরের সন্ধান পাওয়া যায়নি। যদিও মালাক্কা থেকে লেখা একটি পর্তুগীজ লেখায় গৌড়কে বন্দর হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শহরটির নদীর

Dhaka University Institutional Repository

তীরে জাহাজঘাট নামক একটি বন্দর ছিল বলে এটি বন্দর নগরী হিসেবেও পরিচিত হত। ডি বারোজ (১৫৫৪) লিখেছেন "বৃক্ষ এবং বাগান সমৃদ্ধ চওড়া রাস্তা এবং অসংখ্য ইমারত আর মানুষের শহর গৌড়। অনতি উঁচু ইমারতগুলো ইট নির্মিত। কিছু কিছু ইমারতের মেঝে চায়নিজ টাইলসে নির্মিত ছিল। এখানে ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বেলবারি মাদ্রাসা নামক একটি মাদ্রাসা রয়েছে।"[২৬] পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে গৌড় শহর বেশিদিন টেকেনি। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই বাংলায় রাজনৈতিক আবর্তে গৌড় শহরের প্রসার বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের পর সোলাইমান কাররানী তান্ডা শহরে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যায়। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের বিজয় হলে মুনিম খান আবার গৌড়ে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু ভয়াবহ মহামারীতে গৌড়ে বহু লোকের মৃত্যু হয় এবং মুনিম খানও মারা যান। এরপরই রাজধানী গৌড় থেকে সরে যায় এবং শহরটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যদিও সুলতান শাহ সুজা ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের পর গৌড়ে খোঁড়াখুড়ি করে প্রচুর মুদ্রা পান। সম্ভবত তিনিই গৌড় প্রাসাদ অঞ্চলের প্রধান দরজা তৈরি করেছিলেন যেটি লুকোচুরি দরজা নামে এখনও বিদ্যমান।

৫. পান্ডুয়া (ফিরূজাবাদ)

গৌড় থেকে ২০ মাইল এবং বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ শহর হতে ১২ মাইল দূরে পান্ডুয়া শহরটি অবস্থিত। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে পান্ডুয়া হিন্দু রাজাদের রাজধানী ছিল।[২৭] ফিরূজাবাদ নামটি সম্ভবত: সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজশাহের সময়ে (১৩০২-১৩২২খ্রিস্টাব্দ) চালু হয়। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন যে "Shamsuddin Firug Shah and the ambition of Firugiging Bengal cities.[২৮] *রিয়াজুস সালাতীনে* উল্লেখ রয়েছে যে, আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাংলার স্বাধীন সুলতান হন এবং হযরত পান্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন করেন।[২৯] ব্লকম্যান মনে করেন যে, ফিরোজশাহ ত্রিবেণীরও নামকরণ করেন ফিরূজাবাদ। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে (১৩৪২-১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দ) এটি একটি টাকশাল ও রাজধানী শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী ৫০ বছর শহরটি বাংলার রাজধানী ছিল। এটি অত্যন্ত বড় ও জনবহুল শহর ছিল। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪.৫ মাইল এবং প্রস্থ ২ মাইল। পঞ্চদশ শতকের চীনা পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পান্ডুয়াতে দেয়াল প্রাচীর ও উপ-শহর ছিল। রকমারি পণ্যসম্ভার নিয়ে শহরটির বাজারগুলো সুবিন্যস্ত ছিল। ফেইসিন লিখেছেন, "রাজপ্রাসাদ ইট সুরকির গাথুনি দ্বারা নির্মিত, প্রাসাদের দেয়াল উঁচু এবং প্রশস্ত প্রাসাদটির ৩টি অন্ত :দরজা এবং ৯টি মহলের স্তম্ভগুলো পিতলে বাঁধানো, ফুল ও পশুপাখিতে চিত্রিত।"[৩০] শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজি, শেখ আখি সিরাজউদ্দিন উসমান, শেখ আলাউল হক, শেখ নুর কুতুব-ই-আলম, শেখ জাহিদ ও অন্যান্য আরও বহুসুফি পন্ডিত উলেমা ও শিক্ষকদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর কেন্দ্র ছিল পান্ডুয়া।[৩১] এখানে অনেক *খানকাহ* ও *মাদ্রাসা* নির্মিত হয়েছিল। এ সমস্ত *মাদ্রাসা* ও *খানকাহতে* সুফিদের অসংখ্য ভক্ত জ্ঞান আহরণের জন্য ভীড় জমাত। বিদেশগত এসব পবিত্র ব্যক্তিদের উপস্থিতির জন্য শহরটি হযরত পান্ডুয়া নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। দেশীয় কাগজ প্রস্তুতের জন্য শহরটি প্রসিদ্ধ ছিল ।

উল্লেখ্য যে গৌড় থেকে রাজধানী পান্ডুয়ায় স্থানান্তরের কারণ জানা যায়নি। শ্রী মনোমোহন চক্রবর্তী বলেন যে "নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে লখনৌতি অস্বাস্থ্যকর ও বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের কারণে শহরটিতে ব্যাপক লুটপাট হওয়ার ফলেও শহরটির স্থানান্তর

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।"[৩২] এছাড়াও পান্ডুয়ার প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত কীর্তিরাজীর বিবরণ দিতে গিয়ে বুকানন হ্যামিলটন বলেন যে "১২ থেকে ১৫ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট খানিকটা আকাঁবাকাঁ ইট বাঁধানো রাস্তাটিকে দেখলে মনে হয় এটি বুঝি সারা শহরকে বেষ্টন করে আছে। শাহ মখদুম শাহের ফটকের প্রায় আধা কিলোমিটার দক্ষিণ হতে শুরু করে এটি উত্তরে পাঁচ ছয় মাইল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, আর এ রাস্তাটির দু'পাশে ইটের স্তুপ পড়েছিল যা কিনা আরো নতুন স্থাপনা প্রতিষ্ঠার ইংগিত প্রদান করে।"[৩৩] মূলত হযরত পান্ডুয়ার সবচেয়ে জাকজমকপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ স্থাপত্যিক নিদর্শন হল বিখ্যাত আদিনা মসজিদ কমপ্লেক্স।[৩৪] সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে পান্ডুয়া থেকে রাজধানী পুনরায় গৌড়ে ফিরিয়ে নেয়া প্রসঙ্গে মনোমোহন চক্রবর্তী বলেন, "The river receeded from Pandua and made it less accessible and more unhealthy. A change in the dynasty also facilitated the removal."[৩৫] ঐতিহাসিক আব্দুল করিমের মতে বিভিন্ন গোলমালের (ফিরোজ শাহের আক্রমণ, ইব্রাহিম শর্কির আক্রমণ) ফলেই পান্ডুয়া শহর পরিত্যাগ করে সুলতানরা গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। মহানন্দা নদীর গতি পরিবর্তন এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ কর্তৃক গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরের ফলেই শহরটি অবক্ষয়ের শিকার হয়। ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ রায়ের মতে পান্ডুয়াতে যখন জনবসতি বাড়তে থাকে তখন নদী খুব কাছে ছিল। মূলত লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে এবং চতুর্দিকে ক্রমশ পাঁচিল ঘেরা হবার ফলে জায়গার অভাব দেখা দিতে থাকে। ফলে গৌড় শহরে লোকবসতি বাড়তে থাকার কারণে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজধানী স্থানান্তর করা হয়। পান্ডুয়া তখন ধর্মীয় শহর বা হযরত পান্ডুয়া হিসেবে চলতে থাকে। কিন্তু শহরের বাকি বৈশিষ্ট্যগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

৬. সাতগাঁও/সপ্তগ্রাম

প্রাচীন সপ্তগ্রাম সুলতানী আমলে সাতগাঁও নামে গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। বর্তমানে ভারতের পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার অন্তর্গত মগরা থানায় পুরাতন সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত[৩৭] অর্থাৎ ত্রিবেণী তীর্থের গঙ্গা স্বরসতীর মিলন স্থলে এবং ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের আদি সপ্তগ্রাম ষ্টেশনের অনতিদুরে এই সাতগাঁও নগরী অবস্থিত ছিল। সাতটি গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল বলে সাতগাঁও বলা হত। এখানকার বিক্ষীপ্ত পুরাকীর্তিসমূহ দেখে অনুমান করা যায় যে, এই অজপাড়াগাঁ এককালে একটা বিখ্যাত নগরী ছিল। বাঁশবাড়িয়া, বাসুদেবপুর, নিত্যানন্দপুর, কৃষ্ণপুর, শিবপুর, সম্ভচোরা, বাদলঘাঁটি ইত্যাদি গ্রামগুলো আজও ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর চিহ্ন বহন করছে। সপ্তগ্রামকে প্রধান রাজকীয় বন্দর বা বাংলার 'গাঙ্গেস রেজিয়া' বলা হত।[৩৮] ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতির সুলতান রুকনুদ্দীন কায়কাউসের সেনাপতি জাফরখান গাজী সাতগাঁও জয় করে এ অঞ্চলকে মুসলিম শাসনাধীনে আনয়ন করেন। তার সহযোগী ছিল সুফি শাহ সফিউদ্দিন।[৩৯] জাফর খান গাজীই বিজিত সাতগাঁও তথা দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার প্রথম মুসলিম গভর্ণর। ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ইউনিটে বিভক্ত করা হয় লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও। চতুর্দশ শতকের দিকে শহরটি দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৩২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে এটি একটি টাকশাল শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় যা প্রায় একশত বছর পর্যন্ত চালু ছিল। টাকশাল স্থাপনের ফলে ব্যবসায়ী ও বণিকগণ এখানে বসতি স্থাপন শুরু করে। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পান্ডুয়া থেকে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরের ফলে সাতগাঁও একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে। সপ্তগ্রাম বন্দর সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ রায় বলেন "সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে প্রধানত: বহির্বাণিজ্য করত বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় বণিক ও বিদেশী বণিক।"[৪০]

মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলে আগত বিদেশী পর্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তে বাংলার সোদকাওয়ান (সাতগাঁও) বন্দরের কথা জানা যায় ।[৪১] ইবনে বতুতার সাতগাঁও এর বর্ণনা দিয়ে প্রফেসর নীরোদ ভূষণ রায় বলেন "He (Ibn Batuta) entered the province through the estuary of the Hughli and passing by Satgaon, a great port situated on the sea coast". আবুল ফজলের বর্ণনা মতে, গঙ্গা ও যমুনা যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানেই সাতগাঁও অবস্থিত ।[৪২]

১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে কারখানা স্থাপন করেছিল, তারা শহরটিকে পোটো পেকুইনো (ক্ষুদ্র বন্দর) বলে ডাকত এবং চট্টগ্রামকে পোটো গ্রানিক (বৃহৎ বন্দর) হিসেবে অভিহিত করত। শহরের রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল চাল, সুতিবস্ত্র, চিনি, লম্বা মরিচ, গালা ইত্যাদি। সপ্তগ্রাম ছিল তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ বন্দরের মধ্যে অন্যতম।

১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিরচিত কবি বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে সপ্তগ্রাম বন্দরের সমৃদ্ধির বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া সপ্তগ্রাম বন্দর সম্পর্কে কবিকঙ্কন বলেছেন:

> সপ্তগ্রামের বেনে সব কোথাও না যায়,
> ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।[৪৩]

এ বর্ণনা থেকে মনে হয় ঐ সময়ে সপ্তগ্রাম ছিল বেচাকেনা ও আমদানি রপ্তানির কেন্দ্রস্থল। সপ্তগ্রাম বণিকদের নিয়ে চৈতণ্যের সমসাময়িক বাসুদেব ঘোষ তার

Dhaka University Institutional Repository

কড়চাতে একটি অধ্যায় লিখেছেন। তিনি সপ্তগ্রামের বণিকদের ৩টি জাতের কথা বলেন সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক ও কংসবণিক। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চন্ডীমঙ্গলকাব্যে উল্লেখ করেছেন যে "সপ্তগ্রামের বণিকরা কোথাও না গিয়ে সপ্তগ্রামে বসেই ব্যবসা করত।"[৪৪] তোমে পিরেস, ফ্রেডারিক, ভিনসেন্ট লি ব্লাংক, রালফ ফিচ প্রমুখের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ষোড়শ শতকের শেষের দিকে শহর হিসেবে সাতগাঁও ছিল সমৃদ্ধ জনবহুল। বন্দরের প্রচুর মালবোঝাই জাহাজ নোঙ্গর করে থাকত। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে হুগলীতে পর্তুগীজরা নতুন বন্দর স্থাপন করলেও ১৫৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে শহরটি (সাতগাঁও) ৫৩টি মহলসহ একটি সরকারের সদর দপ্তরে পরিণত হয়।[৪৫] চর্তুদশ শতকে শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে সাতগাঁও প্রসিদ্ধ ছিল। সাতগাঁও অঞ্চলের প্রশাসক জাফর খান গাজী এখানে একটি মসজিদ সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার সু-বন্দোবস্ত ছিল। বিপ্রদাস, বৃন্দাবন ও জায়ানন্দ প্রমূখ লেখকদের সমসাময়িক লেখা থেকে জানা যায় যে, পঞ্চদশ শতকে শহরটি সাংস্কৃতিক ও বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ধারণা করা যায় শহরটি বিশ্বজনীন ও ধর্মনিরপেক্ষ শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল যেখানে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়সমূহ নিজ নিজ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ব্রতে বসবাস করত। সাতগাঁও এর পতনের জন্য শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার স্বাধীন সালতানাতের পতনকে দায়ী করেছেন।[৪৬] সপ্তগ্রামে পর্তুগীজদের আগমন ঘটে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে। এ সময় থেকেই সপ্তগ্রামের পতন শুরু হয়। পর্তুগীজ জলদস্যুরা ভাগীরথীর মোহনায় আক্রমণ করে। তাছাড়া স্বরস্বতী নদী দিয়েও বড় জাহাজ ঢুকতে পারেনি। শেরশাহ ও হুমায়ুনের গৌড় আক্রমণ করার পর রাজধানীর রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বেশি বেড়ে গিয়েছিল। কিছুদিন পরে উড়িষ্যার রাজার আক্রমণ, মুঘল ও পাঠানদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে ভাগীরথীর উত্তরভাগ বিপদগ্রস্থ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়েছিল। ফলে রাজধানীর প্রধান জোগানদার হিসেবে সপ্তগ্রামের ভূমিকার গুরুত্ব কমে যায় এবং কেন্দ্রীভূত রাজধানীর বদলে তখন ভাগীরথীর তীরে ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছিল। সপ্তগ্রামের বণিকরা ঐ সময়ে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সপ্তগ্রাম ছেড়ে ওই সব ছোট শহরে বাস করতে শুরু করেছিল, যার ফলে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ ইত্যাদি ছোট শহরগুলো বড় হতে শুরু করেছিল। ফলে সপ্তগ্রাম বন্দরের পতন ঘন্টা বেজে উঠেছিল।[৪৭] সপ্তদশ শতকের শুরুর দিকে বন্দর নগরী হিসেবে শহরটির গুরুত্ব কমে যায় কারণ সরস্বতী নদী তখন পলিভরাট হয়ে শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এছাড়া আফগানদের রাজনৈতিক গোলাযোগও শহরটির পতনের জন্য দায়ী ছিল।

৭. সোনারগাঁ

বাংলার নদ-নদী দ্বারা বেস্টিত রাজধানী শহর ছিল সোনারগাঁ। পূর্বে মেঘনা নদী, পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী এবং দক্ষিণে শীতলক্ষ্যার সাথে ব্রহ্মপুত্র নদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। সুবর্ণ গ্রামের ইসলামী নাম ছিল সম্ভবত সোনারগাঁ। ঐতিহাসিক মোহর আলী (Mohar Ali) বলেন যে, সোনারগাঁ বর্তমান ঢাকা মহানগরী থেকে আনুমানিক ১৪/১৫ কি.মি. পূর্বে পুরাতন মেঘনা ব্রহ্মপুত্রের সংযোগস্থলের একটি বৃহত্তম নগরী ছিল।[৪৮] বর্তমানের আমিনপুর, পানাম নগরী, গোয়ালদি, মোগরা পাড়া ইত্যাদি গ্রামগুলো ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর স্থান নির্দেশ করছে। সোনারগাঁ ছিল পূর্ব বাংলার রাজধানী।[৪৯] এয়োদশ শতকের শুরুর দিকে স্থানীয় রাজা দুনজ মর্দন দমরথ দেবের রাজধানী ছিল এটি। সুলতান শামসউদ্দীন ফিরূজশাহ ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি টাকশাল স্থাপন করেন ফলে এটি মধ্যযুগীয় বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে আবির্ভূত হয়। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক লক্ষণাবতী বিজয়ের সময় রাজা লক্ষ্মণসেন পূর্ব বাংলায় পালিয়ে যায়। তাঁর উত্তরসুরীগণ সম্ভবত সূবর্ণগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

থেকে প্রায় শতাব্দীকাল শাসন করেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী উল্লেখ করেন যে, "সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন বিদ্রোহী তুঘ্রীল খাঁকে দমন করার জন্য বাংলায় আগমন কালে (১২৮০ খ্রিস্টাব্দে) রায় দুনজ নামক যে হিন্দু নরপতি সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি খুব সম্ভব লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশব সেনের সন্তান।"[৫০] রায় দনুজের প্রকৃত নাম ছিল দনুজ মাধব সেন। মুসলিম ইতিহাসে তিনি সোনারগাঁ এর রায় (রাজা) দনুজ বলে পরিচিত। তিনি তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমনে বলবনকে সাহায্য করেছিলেন। মি.টেলরের মতানুসারে সোনারগাঁ মুসলমান কাজীদের হস্তগত হয়।[৫১] আবদুল্লাহ ফারুক তাঁর *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস* গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম শাসক তুর্কো আফগানগণের সময়েই ঢাকার অদূরে সোনারগাঁ শহরের পতন হয়। এটা ছিল ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র এবং ঐ সময়ে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতি বৃদ্ধি পায়।[৫২]

449663

১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দীন মুবারকশাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করে সোনারগাঁয়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনিই হলেন সোনারগাঁয়ের প্রথম স্বাধীন সুলতান।[৫৩] তিনি হযরত জালাল সোনারগাঁ হতে ১৩৩৮ থেকে ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুদ্রাঙ্কন করেন।[৫৪] তার রাজত্বকালে বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁকে একটি ক্রমবর্ধমান বন্দর হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন, এবং এখান থেকে তিনি জাহাজে চড়ে জাভা ও সুমাত্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।[৫৫]

সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময়ে সোনারগাঁ বাংলার একটি প্রদেশে (ইকলিমে) রূপান্তরিত হয় এবং সোনারগাঁ ছিল সেই ইকলিমের রাজধানী এ সময়ে কয়েকটি মুদ্রায় সোনারগাঁ ও কয়েকটি মুদ্রায় মুয়াজ্জেমাবাদ লেখা পাওয়া যায়। ব্লকম্যান মনে করেন যে, মুয়াজ্জেমাবাদ ব্রহ্মপুত্রের বিপরীত পারে

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সোনারগাঁ এর প্রায় ১২ মাইল উত্তর পশ্চিমে সরকার সোনারগাঁ এর একটি পরগণা।[৫৬] 'ইকলিম-ই-মুয়াজ্জেমাবাদ' হচ্ছে 'ইকলিম-ই-সোনারগাঁ' এর পরবর্তী নাম।[৫৭] সিকান্দর শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ রাজধানী সোনারগাঁ থেকে প্রায় স্বাধীনভাবে ১৩৭০-৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অত্যন্ত গৌরবের সাথে ইকলিম মুয়াজ্জেমাবাদে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময়ে সোনারগাঁ এর ইতিহাস সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সোনারগাঁকে একটি সুরক্ষিত রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলেন। কাজী গিয়াসউদ্দিনের আদালতে তার বিচার, সিরাজের সুপ্রসিদ্ধ কবি হাফিজের সাথে তার পত্রালাপ পবিত্র মক্কা ও মদীনায় বহু অর্থ ব্যায়ে মাদ্রাসা স্থাপন ও খয়রাতি সাহায্য প্রেরণ ইত্যাদি বাংলার ইতিহাসে গৌরবজনক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চীনা ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সুলতান চীনের সাথে দূত বিনিময় করেছিলেন।[৫৮] তার দরবারে আগত চৈনিক রাষ্ট্রদূতের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সোনারগাঁ ছিল "a walled place with tanks streets bazars and which carries on a business in all kinds of goods"।[৫৯] ঐতিহাসিক এম আর তরফদার বলেন যে "৯১৯ হি:/১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে হোসেনশাহের উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ত্রিপুরা ও ইকলিম মুয়াজ্জেমাবাদের সেনাপতি শের-ই-লস্কর ছিলেন খাবাজ খান (Khawas Khan)।[৬০] আলাউদ্দিন হোসেনশাহের সময় সোনারগাঁ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সুলতান আসাম ও ত্রিপুরার যুদ্ধ অভিযানকালে সোনারগাঁয় অবস্থান করতেন।[৬১] মূলত চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত সোনারগাঁ একটি তাৎপর্যপূর্ণ বুদ্ধিভিত্তিক মহানগরীতে পরিণত হয়। এ সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য হিসেবে সোনারগাঁয়ের খুব খ্যাতি ছিল। ইংরেজ পর্যটক রালফ ফিচ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁ পরিভ্রমণ করে বলেন যে, শ্রীপুর থেকে প্রায় ১৫ কি.মি. দুরে অবস্থিত সোনারগাঁ ছিল তৎকালীন সমগ্র

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট কাপড়ের প্রধান বাজার। তাছাড়া এখানকার চাল সমগ্র ভারত, শ্রীলংকা (সেইলন), পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা ও অন্যান্য জায়গায় রপ্তানি করা হত।[৬২] ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে মুঘল আফগান দ্বন্দের মধ্যে পড়ে প্রথমদিকে পূর্ববাংলার কিছুটা উন্নতি হলেও এ উন্নতির ধারা বেশিদিন চলেনি। বহি:শত্রুর আক্রমণ রুখবার জন্য মুঘলরা ঢাকা সুরক্ষিত করতে থাকে, ফলে সোনারগাঁ ক্রমশ পরিত্যক্ত হয়ে যায়। এছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদীর গতি পরিবর্তন ও সোনারগাঁ এর পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৬৩]

মধ্যযুগের সোনারগাঁয়ে পরিখাসহ দুর্গ প্রাচীরবেষ্টিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট বাজার ছিল এবং সব ধরণের পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও বন্টনের জন্য বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর সাথে এর সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। খাসা (khasa) নামে পরিচিত এক ধরনের মসলিন কাপড় এবং দাস ও নপুংসকের বিশাল বাজারের জন্য শহরটি বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। বুখারার সুফি সাধক শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা এখানে একটি খানকাহ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং তারই পৃষ্ঠপোষকতায় শহরটি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠে। পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের অনেকগুলো মসজিদ, আবু তাওয়ামার সমাধী, গিয়াস উদ্দিন আজমশাহের সমাধী সেনাকান্দা দূর্গ, কদমরসুল প্রভৃতি মিলিয়ে এখানে বেশ কিছু প্রাচীন স্থাপত্য রয়েছে।[৬৪]

৮. চাটগাঁ (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রাম ছিল মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর ও শহর। প্রয়াত মৌলভী হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর (Maulavi Hamidullah Khan Bahadur) কর্তৃক রচিত ফার্সি ভাষায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ "আহাদিস উল-খাওয়ানিন বা "তারিখ-ই হামিদী" এ চাটগাঁও এর ইতিহাস বর্ণিত রয়েছে। উক্ত গ্রন্থে লেখক উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

করেন যে, প্রাচীনকালে ভবঘুরে ফকির ও গরীব মুসলমানেরা চাটগাঁও-এ এসে মগ ও হিন্দুদের মন্দিরের পাশে খানকাহ গড়ে তোলে ..... তারা স্থানীয় মুসলমানদেরকে উক্ত *খানকাহ* শরীফে আসার জন্য প্রচারকার্য চালায়। প্রায় আড়াইশত থেকে তিনশত বছর আগে বাংলার শাসক নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ অত্র অঞ্চল দখল করে নেয় এবং মগদের তাড়িয়ে চট্টগ্রামে মুসলিম আধিপত্য ঘোষণা করে। তাতে করে উক্ত অঞ্চলটি 'দারুল ইসলাম' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকান ও চীনের বিভিন্ন পরিব্রাজক, ভৌগোলিক ও পন্ডিতদের লিখিত বিবরণে অঙ্কিত মানচিত্রে এখানকার শাসক গৌড়ের সুলতান এবং রাজাদের মুদ্রায় চট্টগ্রামকে বহু নামে খ্যাত করেছিলেন।[৬৫] মূলত বর্তমান বাংলাদেশের প্রধান আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর ও দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী চট্টগ্রাম প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন নগরী। এটি বঙ্গোপসাগর ও কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত।[৬৬] প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাক্ষ্য বহনকারী এটাই বাংলার একমাত্র নগরী যা এখনও জীবিতই নয়, বরং ক্রমাগত বর্ধিষ্ণু ও উন্নয়নশীল.। বন্দর ও শহর চট্টগ্রামের নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ প্রচলিত তন্মধ্যে ১৪টি ধ্বনিমিলযুক্ত নাম পাওয়া যায়, যা থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। চৈত্যগ্রাম-চট্টগ্রামের বাঙ্গালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অভিমত যে প্রাচীনকালে এখানে অসংখ্য বৌদ্ধ চৈত্য অবস্থিত ছিল বলে এ স্থানের নাম চৈত্যগ্রাম। এই চৈত্যগ্রাম নাম বিবর্তিত হয়ে চট্টগ্রাম রুপলাভ করেছে।[৬৭] চাটিগ্রাম-গৌড়ের রাজা গণেশ দনুজমর্দন দেবের ১৩৩৯-১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে রাজা মহেন্দ্র দেবের চট্টগ্রামে প্রাপ্ত মুদ্রায় টাকশালের নাম চাটিগ্রাম পাওয়া যায়। তাছাড়া কবি পরমেশ্বর বিরচিত পরগলী মহাভারতে ও শ্রীকর নন্দী বিরচিত ছুটিখানি মহাভারতে এবং বৈষ্ণব সাহিত্য ভাগবত প্রভৃতিতে চাটিগ্রাম গ্রামের উল্লেখ রয়েছে।[৬৮] চাটিগাঁ-চট্টগ্রামে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম ছিল জ্বীন-

Dhaka University Institutional Repository

পরী অধ্যুষিত দেশ। পীর বদরশাহ এখানে আগমন করে অলৌকিক চাটির (মৃৎ-প্রদীপ) আলোর তেজের সাহায্যে জ্বীন-পরী বিতাড়িত করার ফলে এই স্থানের নাম হয় চাটিগাঁ।[৬৯] আরাকানি ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, দশম শতাব্দীর আরাকানি রাজা বাংলা জয় করে যে জায়গায় পাথরের স্তম্ভ বিজয় চিহ্ন হিসেবে বসিয়েছিলেন তার নাম দ্বৈত-গং। ধারণা করা হয় এই নাম থেকে বাংলা শব্দ চট্টগ্রাম এসেছে।[৭০] তাছাড়া আরব ভৌগোলিকদের রচনায় যে হরিকেলের কথা পাওয়া যায়, তা বর্তমানের চট্টগ্রাম প্রদেশের মধ্যে ধরা হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক শিহাবুদ্দিন তালিশ লিখেছেন যে, ফখরুদ্দিন চট্টগ্রাম সম্পূর্ণ দখল করে শ্রীপুরের বিপরীত দিকে চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম অবধি এক বড় বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন এবং ঐ সময়ে চট্টগ্রামে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল। পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে বাংলা ও আসাম পরিভ্রমণ করেন। তিনি তার জীবন বৃত্তান্তে চট্টগ্রামকে 'সুদকাওয়ান' বলে উল্লেখ করেছেন।[৭১] তিনি বলেছেন যে সুদকাওয়ান এর সুলতান ছিলেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ যার ফলে সুদকাওয়ান ও চট্টগ্রাম অভিন্ন বলে অনেকের ধারণা। তিনি আরও বলেন মোবারক শাহ ছিলেন সোনারগাঁও এর সুলতান। শামস-ই-সিরাজ আফীফ তার এই মত সমর্থন করেন। এ থেকে মনে করা হয় যে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মুসলমান সুলতানগণ চট্টগ্রাম দখল করেন।

নবম শতক থেকে আরব বণিকগণ এবং অসংখ্য সুফি দরবেশ বাংলার ইসলামের প্রবেশদ্বার এ চট্টগ্রামে পদার্পণ করেছিলেন।[৭২] কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর চার দশক পর্যন্ত চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যে হাত বদল হত। এয়োদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে মার্কোপোলো (১২৭১-১২৯৪) আরাকান রাজ্য

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে যখন চট্টগ্রামে আসেন তখন চট্টগ্রাম আরাকানের অধীনে ছিল। ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে স্যার জন হার্বার্ট চাটগাঁকে অন্যতম সমৃদ্ধশালী ও জনাকীর্ণ নগরী বলে উল্লেখ করেন।[৭৩] অত:পর রাজশক্তিরূপে চট্টগ্রামে মুসলমানদের আবির্ভাব ঘটে। বাংলার স্বাধীন সালতানাতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকারী সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের রাজত্বকালে (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দ) সেনাপতি কদরখান গাজী অথবা সুফি মাহী আছোয়ারের সাহায্যে চট্টগ্রাম জয় করেন।[৭৪] মূলত চতুর্দশ শতকে মুসলমানদের বাংলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে আগমনের মধ্যদিয়ে শহরটি ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগাঁও এর ক্ষমতা দখল করার পর পরই চাটগাঁ বা চট্টগ্রাম অধিকার করেন। চট্টগ্রামের অবস্থান বর্ণনা করে নলিনীকান্ত ভট্টশালী উল্লেখ করেছেন যে, চাটগাঁও (চট্টগ্রাম) সমুদ্র তীরে অবস্থিত।[৭৫] প্রকৃতপক্ষে বাংলায় আসার অর্থই ছিল চট্টগ্রামে আসা। এজন্যই পর্তুগীজরা প্রথম চট্টগ্রামে এসেছিল। বাংলার বৃহৎ দুটি বন্দরকে তারা দুই নামে অভিহিত করেছিলো। সাতগাঁওকে তারা 'পোটো পিকিউনো' (ছোট বন্দর) আর চট্টগ্রামকে 'পোটো গ্রান্ড' (বড় বন্দর) বলত।[৭৬] পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে চীনা মিশনটি বাংলায় পরিভ্রমণ করেন তার নেতা মাহুয়ান (Mahuan) লিখেছেন যে, "সুমাত্রা দ্বীপের বৃহৎ জাহাজটি প্রথমে চান-টি-গান (চাটগাঁও)-এ প্রবেশ করে এবং এখানেই এটি নোঙ্গর করে এবং এখান থেকেই আরো ছোট ছোট নৌকা পুরো সাগর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তন্মধ্যে একটি সুনার কং (সোনারগাঁ)-এ গিয়ে থামে।"[৭৭]

বাংলার প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তি যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন চট্টগ্রাম বাংলার একমাত্র প্রধান বহির্বাণিজ্য বন্দর ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া গৌড়ে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হলে চট্টগ্রাম

বন্দরের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের আমলে চট্টগ্রামে তার শক্তিশালী নৌ-ঘাঁটি ছিল।[৭৮] তখন থেকে স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রায় দুশো বছর চট্টগ্রাম বন্দর বাংলার একটি ঐশ্বর্যশালী ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ বাণিজ্য চলত। ইলিয়াস শাহী শাসনামলে উত্তর চট্টগ্রাম তথা বর্তমানে হাটহাজারী এলাকা মুসলিম শাসনের কেন্দ্র তথা রাজধানী ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।[৭৯] ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে গৌড়, ত্রিপুরা এবং আরাকানের সংঘর্ষ তুঙ্গে ওঠে।[৮০] সাগরতীরের পাহাড় টিলাময় জঙ্গলাকীর্ণ পারিপার্শ্বিক এলাকা ও বন্দর নগরী প্রতিদ্বন্দ্বী উল্লেখিত ত্রিশক্তির মধ্যস্থলে অবস্থিত বলে সামরিক কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান এবং এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব এ সংঘর্ষের প্রধান কারণ। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে হুসাইন শাহের পুত্র নুসরত শাহ আরাকান রাজের দখল থেকে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করে এর নামকরণ করেন ফতেয়াবাদ। অবশ্য বর্তমান চট্টগ্রাম মহানগরীর ৮/১০ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত ফতেয়াবাদ নামক স্থানে নুসরত শাহের মসজিদ, দিঘী, প্রাসাদের ধ্বংসস্তুপ এবং আরো অনেক প্রত্নিদর্শন তার রাজধানীর স্মৃতি বহন করছে। ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ রায় বলেন যে, ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের পর পর্তুগীজরা বাংলায় আসে। আর ঐ সময়ে চট্টগ্রামের সুলতান ছিলেন একজন মুসলমান।[৮১] একই বছরে (১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে) পর্তুগীজ গভর্নর লপো সোয়ারেজ ডি আলবার জারিয়া, পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন, ডি জোয়াও ডি সিলভেরাকে মালদ্বীপ থেকে বাংলা দখলের জন্য প্রেরণ করে। গৌড় তখন বাংলার রাজধানী ছিল। যার শাসক ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। সিলভেরা বাংলার প্রধান বন্দর চট্টগ্রামে অবতরণ করে দূত মারফত সুলতানের কাছে ব্যবসায়িক সুবিধা ও একটি কারখানা স্থাপনের অনুমতি চেয়ে আবেদন পত্র পাঠায়।[৮২] মূলত পর্তুগীজ গোয়ার শাসনকর্তার চিঠি নিয়ে জোঁয়াও কোয়েলা নামক এক দূত ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের

Dhaka University Institutional Repository

লাইলী-মজনু কাব্যের রচয়িতা কবি দৌলত উজির বাহরাম খান ফতেয়াবাদ তথা চট্টগ্রামের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন-

নগর ফতেয়াবাদ দেখিতে পুর এসাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ
মনোহর মনোহর অমরাবতীর সম
সাধু সৎ অনেক নিবাস।[৯০]

বাহরাম খার প্রশংসিত ফতেয়াবাদ বেশি দিন স্থায়ী ছিল না। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের নিকট গৌড়ের সুলতান মাহমুদ শাহ পরাজিত ও নিহত হলে বাংলার দু'শো বছরের স্বাধীনতার পরিসমাপ্তি ঘটে। বাংলার বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বন্দর চট্টগ্রাম ছিল রাজধানী গৌড়ে প্রবেশের মূল প্রবেশ পথ। বর্তমানে এটিকে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী বলা হয়। শহরটি সাধু-সন্ন্যাসীদের (দরবেশ ফকির) ভূমি নামেও পরিচিত। বেশ কিছু পুরাতন মসজিদ, সমাধি, খানকাহ অদ্যাবধি বিদ্যমান। মূলত, মুসলিম শাসনামলে চট্টগ্রাম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল। বায়েজীদ বোস্তামীর দরগাহ ও মাজার হযরত বদর আওলিয়া হযরত শাহ আমানাত প্রমূখের এই শহরে উপস্থিতি ছিল বলে ধারণা করা হয়।[৯১]

৯. তান্ডা

'তান্ডা' শব্দের অর্থ উচ্চভূমি। বর্তমানের মালদহের ১৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এটি অবস্থিত ছিল। ষোড়শ শতকের দিকে গঙ্গা নদী ঠিক যেখান থেকে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়েছিল তান্ডা সেখানেই অবস্থিত ছিল। মুঘলদের বাংলা বিজয়ের প্রাক্কালে একটি উল্লেখযোগ্য রাজধানী নগরী ছিল তান্ডা। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে সোলায়মান কররানী এটিকে বাংলার রাজধানী করেন। মানসিংহ কর্তৃক (১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে) মুঘল বাংলার রাজধানী হিসেবে রাজমহলকে

Dhaka University Institutional Repository

(আকবর নগর) স্বীকৃতি দেবার পূর্ব পর্যন্ত শহরটি বাংলার রাজধানী ছিল। ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে টাকশাল হিসেবে এর আবির্ভাব ঘটে। চার্লস স্টুয়ার্ট বলেন যে, ৭৯২ হিঃ (১৫৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দ) তাজ খানের মৃত্যুর পর সোলাইমান বাংলার দিকে যাত্রা শুরু করে কিন্তু এর পূর্বে অনেক রাজা গৌড়ে মৃত্যুবরণ করায় তিনি এটিকে একটি অস্বাস্থ্যকর বা অলক্ষুণে স্থান হিসেবে বিবেচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি তানডাহ বা তান্ডাকে তার রাজধানী হিসেবে বেছে নেন।[৯২] সুচতুর সোলায়মান শাহ মুঘলদের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে খুব সর্তক ছিলেন। তার নামে কোন মুদ্রা আবিস্কৃত হয়নি। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন "He built up a rich treasury by raiding Orissa and Kuchbihar and extended his hold over the unsubdued Bengal districts North an East of his Capital Tandah (South of Gour)."[৯৩] সোলায়মানের জ্যৈষ্টপুত্র বায়েজিদ শাহ (১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে) এবং কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ শাহ (১৫৭৬-৭৬ খ্রিস্টাব্দ) এখান থেকে নিজ নিজ নামে খোতবাহ পাঠ ও মুদ্রাঙ্কন করেন।[৯৪] কাজেই সোলায়মান শাহ সম্রাট আকবরের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চললেও দাউদের বেপরোয়া মনোভাবের ফলে মুঘলদের হাতে তান্ডার পতন ত্বরান্বিত হয়। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর সুবাদার মুনিমখান তান্ডা অধিকার করেন। মুনিম খান স্থানটি পছন্দ করেননি। তাই তিনি তার বাহিনীসহ গৌড়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু অচিরেই গৌড়ে প্লেগরোগ মহামারী আকারে দেখা দিলে হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। মুনিম খান শীঘ্রই রাজধানী তান্ডায় ফিরিয়ে নেন। তথাপিও তিনি প্লেগের মরণ ছোবল থেকে রেহাই পাননি।[৯৫] তাছাড়া গঙ্গানদীর গতি পরিবর্তনই রাজধানী স্থানান্তরের প্রধান কারণ। ইংরেজ পর্যটক রালফ ফিচ বর্ণনা করেন যে "তান্ডা গঙ্গা নদী থেকে প্রায় তিন মাইল দুরে অবস্থিত ছিল। কারণ অতীতে বৃষ্টির সময় নদীর পানিতে পার্শ্ববর্তী লোকালয় ও গ্রাম প্লাবিত হত। তাই তারা পরবর্তীতে

রাজধানীকে নদী থেকে কিছু দুরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।"[৯৬] এভাবেই রাজধানী হিসেবে তান্ডা পরিত্যক্ত হয়ে যায়, মূলত রাজমহলকে (আকবর নগর) রাজধানী করার ফলে গুরুত্বপূর্ণ শহর তান্ডা তার মর্যাদা হারাতে থাকে। পরে এটি ৫২টি মহলসহ একই নামের সরকারের একটি প্রশাসনিক কেন্দ্রে রূপান্ত রিত হয়। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের একটি বিশাল অংশ নিয়ে সরকার তান্ডা গঠিত হয়েছিল।

১০. হুগলী

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদীর তীরে ষোড়শ শতকের দিকে পর্তুগীজরা এই বন্দর নগরটির গোড়াপত্তন করে। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে সরস্বতী নদীর মোহনায় বালি সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে পর্তুগীজ বণিকরা দেখল যে সাতগাঁও পোতাশ্রয়টি আর ব্যবহারের উপযোগী নেই। তাই তারা নদীটির ডান তীরে একটি ছোট্টগ্রাম ঘোলাঘাটে বন্দর স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ রায়ের মতে, সপ্তগ্রাম বন্দরটি পলিমাটিতে ভরাট হয়ে যাবার ফলে বড় জাহাজ আর আসতে পারছিল না, যার ফলে গঙ্গার উপরে পর্তুগীজরা আকবরের কাছ থেকে ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে ফরমান নিয়ে হুগলি বন্দরের প্রতিষ্ঠা করে।[৯৭] পর্তুগীজদের প্রধান শ্যাম্পরি ও ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন। এই পর্তুগীজ বসতিটি এখানে গঞ্জ বা মাঠ বলে পরিচিতি পায়। সালতানাতের পতনের পর ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে পেদ্রো তাবারিজের (Peodro Tavares) নেতৃত্বে পর্তুগীজদের একটি প্রতিনিধি দল সম্রাট আকবরের সাথে সাক্ষাৎ করে ঘোলাঘাটে উপনিবেশ স্থাপনের অনুমতি লাভ করেন। ঘোলাঘাটে এই পর্তুগীজ স্থাপন শীঘ্রই ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং হুগলী নদীর নামানুসারে এই হুগলী বান্দেল নামে পরিচিতি পায়। বান্দেল শব্দটি পর্তুগীজ

Dhaka University Institutional Repository

বন্দর শব্দটির বিবর্তিত রূপ যার অর্থ বন্দর বা শহর। বন্দর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে এটি 'পোটো পিকুইনো (ছোট শহর)' নাম ও মর্যাদা লাভ করে।[৯৮] সুলতানী আমলে বাংলায় কিছু প্রাচীন শহর পুনরুজ্জীবিত হলেও বেশ কিছু নগর কেন্দ্র বা শহর নানা কারণে নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছিল। এসব শহরগুলোর পরিধিও ছিল ছোট, সুপরিকল্পিত ও সুরক্ষিত। তাছাড়া এসব শহরগুলো গ্রামীণ পণ্য-সামগ্রী নির্ভর ছিল এবং তৎকালীন সময়ে বৃহৎ আকারে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি তাই শহরগুলো তেমন কোন অবদান রাখতে পারেনি। এ কারণে ঐ সময়ের শহরগুলোকে ভোক্তা শহর (consumer city) বলা হতো।[৯৯] মূলত সুলতানী বাংলার শহরগুলোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অস্থবিরতা। কারণ শহরগুলো নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল তাই নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সাথে শহরগুলোর ভাগ্য নির্ধারিত হত। তাছাড়া তৎকালীন সময়ে ইট বা পাথরের তৈরি ইমারত ছিল বিরল। বেশির ভাগ ঘর-বাড়ি বাঁশ, খড় বা কাদা নির্মিত ছিল আর রাস্তাগুলো ছিল সরু। তবে অভিজাত ও ধনীদের বেলায় অবশ্য ইটের ব্যবহার ছিল। তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন ইমারতের মধ্যে ছিল মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, গীর্জা, কাটরা ইত্যাদি। এ সব ইমারতগুলোর মধ্যে কিছু ইমারতের ধ্বংসাবশেষ সুলতানী আমলের সাক্ষ্য হিসেবে আজও বিদ্যমান রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. খান সাহেব আবেদ আলী খান, *গৌড় ও পান্ডুয়ার স্মৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১; আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৯৩ ; J. N. Sarkar, *History of Bengal,* vol.2, Dacca, 1976, p. 4

২. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, vol.1, (1203-1576), Karachi, 1963, p. 125; অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২৭

৩. Md. Akhtaruzzaman, "Process of Urbanization in Early Muslim Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Hum. 46(1), June 2000, pp. 35-44

৪. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৬০

৫. Md. Akhtaruzzaman, op.cit, pp. 35-44,

৬. জিয়াউদ্দীন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী,* গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৯২-৯৩; Md. Akhtaruzzaman, *op.cit,* pp. 35-44

৭. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*-১, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৫১২-৫২২

৮. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্য ভগবৎ আদিপর্ব,* ২য় অধ্যায়, পৃ. ৯ ; এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, *মুদ্রাও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ সংস্কৃতি*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৮৫

৯. Khan Sahib Muhammad Abid Ali Khan, *Memoirs of Gour and Pandua.* edited & revised by H.E. Stepleton, Calcutta, 1724, p. 15

Dhaka University Institutional Repository

১০. সুখময় মুখ্যোপাধ্যায়, *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব,* কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১২

১১. Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* Vol.I(B), Rayadih, 1985, p. 949

১২. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩৫

১৩. মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৬-৬৮; Manomohan chakravarti, Notes on Gour and other place in Bengal, vol.v, 1909. p. 199.

১৪. খান-সাহেব আবেদ আলী খান, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪-১০; মো: আখতারুজ্জামান, নগরায়ণ: মধ্যযুগ ও উপনিবেশিক পর্ব, ২০০৭, পৃ. ৭

১৫. Khan Sahib Muhammad Abid Ali Khan , *op.cit* , p. 42

১৬. গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজুস সালাতীন,* শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৮

১৭. H.E. Steplaton and Abid Ali Khan, *Memoirs of Gour and pandua,* London 193, p. 23-52; ABM Hussain (ed) *Gaur - Lakhmauti*, Dhaka, 1997, pp. 14-43

১৮. Abul Fajl-Allami, *Ain-i-Akbari* tra. by H.S. Jarret corrected and Further annovated by J.N. Sarkar, Calcutta. 1945, p. 135

১৯. গোলাম হোসেন সলীম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১০৮

২০. অনিরুদ্ধ রায়, "ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার নগর বিন্যাস ও সামাজিক পরিবর্তন", *হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ,* পৃ. ২২০-২২২

২১. এ বি এম হোসেন, স্থাপত্য, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*-২, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ২০; মো: আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.৭

২২. A.Cunningham, Archaological Survey of India, (ASI) xv, Calcutta, pp. 95- 100

Dhaka University Institutional Repository

২৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩৭

২৪. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

২৫. ঐ

২৬. মো: আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২৭. Khan Saheb-Abid Ali Khan, *op.cit*, p. 94

২৮. J.N Sarkar, *History of Bengal*. voll.II, D.U. 1972, p. 8

২৯. গোলাম হোসেন সলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

৩০. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৮

৩১. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, ১৯৮২, পৃ. ১৬৬

৩২. Monomohan Chakravarti, *op.cit*, p. 204

৩৩. Buchanon Hamilton, Dinajpur, *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* 1833, pp. 41-43.

৩৪. A.H.Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Dacca, 1961, pp. 55-71

৩৫. Monomohan chakravarti, *op.cit*, p. 199

৩৬. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২

৩৭. বিশ্বকোষ, একবিংশ ভাগ, ১৩১৭ সাল, পৃ. ২০৭

৩৮. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩

৩৯. গুধীর কুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৭২১-৭২২

৪০. অনিরুদ্ধ রায়, *সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি সমীক্ষা*, *কলকাতা*, ১৯৯৭, পৃ. ৩৪

৪১. ওয়াকিল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৩

Dhaka University Institutional Repository

৪২. J.N Sarkar, *History of Bengal*. Voll.II, D.U. 1972, p.100

৪৩. শ্রী নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৬১, পৃ. ৪২

৪৪. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭

৪৫. মো: আখতারুজ্জামান, 'নগরায়ণ' মধ্যযুগ ও উপনিবেশিক পর্ব, ২০০৭, পৃ. ৯

৪৬. Rakhal Das Babdyopadhaya, "Saptagram or Satgan " *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* , July 1909, pp. 249-250

৪৭. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

৪৮. Muhammad Mohar Ali, *op.cit* , p. 955

৪৯. J.N Sarkar, *op. cit*, p. 528.

৫০. বিশ্বকোষ, দ্বাবিংশ ভাগ কলিকাতা, ১৩১৭, পৃ. ৭০

৫১. J.Wise, Notes on Sonargaon, Eastens Bengal, *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* , vol.XLIIL, 1974, Port.1, p. 82; মোশাররফ হোসেন, পৃ.৭২-৭৩

৫২. আবদুল্লাহ ফারুক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

৫৩. Habiba Khatun, *Sonargaon Its History and Monuments*, Ph.D thesis, (Published) p. 25

৫৪. Abdul Karim, *Corpus of the Muslim coins in Bengal*, Dacca.1960, pp.36-37

৫৫. ওয়াকিল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৫৬. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭

৫৭. হাবিবা খাতুন, 'সোনারগাঁও রাজধানী শহর ও বন্দর', *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, একবিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা-১৩৯৪, পৃ. ৬১

৫৮. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮, পৃ. ৭৭

৫৯. *Visva Bharati Annals*, vol.1, 1945, p. 117

৬০. M.R Tarafdar, *op. cit*, p. 54

Dhaka University Institutional Repository

৬১. গুলশান আহমেদ, 'সোনারগাঁও পরিচিতি', *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা* ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৭৬, পৃ. ৩০০-৩০১

৬২. Mohar Ali, *op.cit*, p. 955

৬৩. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬

৬৪. মো: আখতারুজ্জামান, নগরায়ণ: মধ্যযুগ ও উপনিবেশিক পর্ব, ২০০৭, পৃ. ১০; মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া, পৃ. ৭১-৭৪

৬৫. আব্দুল হক চৌধুরী, *বন্দর শহর চট্টগাম*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ০১

৬৬. বিশ্বকোষ, শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ০১

৬৭. আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০১

৬৮. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪

৬৯. এল, এস এস ও'মিল, *ইস্টার্ণ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স*, চট্রগ্রাম, ১৯০৮, পৃ. ০১

৭০. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬১

৭১. Ibn Battuta, *The Rehla of Ibn Battuta*, (eng.tr.) Agha Mahdi Hussain, Baroda,1976, 237; সুখময় মুখ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৭

৭২. Sayed Murtaza Ali, *History of Chittagong*, Dhaka, 1964, p.9

৭৩. মাহবুবুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানা আমল), চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ.৪৫*

৭৪. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫-১৮৮

৭৫. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম*, অনুবাদ মো: রেজাউল করিম, ভূমিকা মমতাজুর রহমান তরফদার, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ১০৫

৭৬. ঐ , পৃ. ১২১

৭৭. P.C Bagchi, *Visva Bharati Annals*, Vol.1, 1945, p.128

৭৮. আব্দুল করিম , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯

৭৯. আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, চট্টগ্রাম, ১৯৮২, পৃ. ৮০-৮১

Dhaka University Institutional Repository

৮০. M.R.Tarafdar, *Op.cit*, p. 55

৮১. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৬৩

৮২. Abdul Mannan, Commercial Persuits of the Portuguese in Chittagong: an Overview, *Chittagong University Studies*, Commerce vol.1, 1985, p. 135

৮৩. আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

৮৪. আবদুল্লাহ ফারুক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

৮৫. আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

৮৬. আবদুল্লাহ ফারুক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

৮৭. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, মধ্যযুগ, কলিকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৫৮

৮৮. ওয়াকিল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

৮৯. আাবদুল হক চৌধুরী, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৫৫

৯০. দৌলত উজির বাহরাম খান, *লাইলী মজনু* (আহমদ শরীফ সম্পাদিত) ঢাকা, ১৯৫৭, পৃ. ৬

৯১. মো: আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৯২. Charles Stuart, *History of Bengal,* London, 1913, p.149

৯৩. J.N Sarkar, *op. cit,* p. 182

৯৪. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ.১২

৯৫. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Karachi, 1963, p.18

৯৬. Ibid

৯৭. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৬

৯৮. মো: আখতারুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২-৫২২

৯৯. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সুলতানী বাংলার অর্থনীতি ও নগরায়ন

সুলতানী শাসন বাংলার অর্থনৈতিক জীবনকে সম্মৃদ্ধশালী করেছিল। সুলতান, প্রশাসক ও সুফিগণ কর্তৃক সৃষ্ট নগরায়ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সুষম অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছিল। এছাড়া সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা, সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার যুগপৎ মিলনে সাধারন মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এনেছিল। প্রথম পর্যায়ে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তি বাংলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল এবং দেবকোট, মহীসন্তোষ এবং লখনৌতিতে অধিকাংশ রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। মুসলিম শাসন সু-প্রতিষ্ঠার পর এক শতাব্দীর মধ্যে লখনৌতি রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হয় এবং ভাগীরথীর উভয় তীরের অঞ্চলগুলো এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সাতগাঁ, পান্ডুয়া এবং ত্রিবেণীতে বসতি স্থাপন শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা শাসকদের বাধা প্রদান করেনি বরং গঙ্গাপথে এবং সাতগাঁওয়ের বাণিজ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলা যে সামুদ্রিক বাণিজ্য গড়ে তুলেছিল সেটাও মুসলিম শাসকদের সাফল্যের কারণেই সম্ভব হয়েছিল।[১] সমুদ্র ভ্রমণ, বাণিজ্যিক কর্মদ্যোম, নতুন নতুন প্রযুক্তি মুসলমানগণ প্রথম এ দেশে আনায়ন করেন যা বাণিজ্য বিস্তারে ও শিল্পের উন্নয়নে যথেষ্ঠ অনুপ্রেরণা দান করেছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে সেন শাসনামলের সাথে মুসলিম শাসনামলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সেনামলে বহির্বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং গ্রামীণ অর্থনীতি জনজীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।[২] কিন্তু মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

শাসনের প্রথম দিকে শুধু সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবেই নয়, বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রচলন হয়। স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সাতগাঁও, সোনারগাঁও এবং চট্টগ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এছাড়াও টাকশাল নগরীর পওনের ফলে পর্যাপ্ত ধাতব মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়। অন্যদিকে সামুদ্রিক বাণিজ্য পুন:প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে বাংলার যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। বাংলাকে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলনের উপর প্রতিষ্ঠিত নাগরিক পর্যায়ে নিয়ে আসার পেছনে সুলতানী আমলের নগরায়ন একটি বিরাট ভূমিকা রেখেছিল।[৩] কৃষিজ এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি সংবলিত রপ্তানি বাণিজ্যের বিরাট সম্ভার বঙ্গদেশে প্রচুর স্বর্ণ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সমাগমের মূল কারণ। এসব দ্রব্য বাংলাকে পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা সম্পদশালী দেশে পরিণত করে। পর্যটক বার্নিয়ারের (১৬৫৬-১৬৬৪) মতে, "মিশরকে যদিও সকল যুগের সকল দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও ঐশ্বর্যশালী দেশ মনে করা হয়। এমনকি বর্তমান কালের লেখকরাও মনে করেন যে, মিশরের মত প্রাকৃতিকভাবে এত ঐশ্বর্যশালী দেশ পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু বাংলায় দু'বার ভ্রমণের পর আমার যে অভিজ্ঞতা হল তাতে মনে হয়েছে মিশরের স্থান বাংলার পরে।"[৪]

সমকালীন বাংলা সাহিত্য, ইবনে বতুতার বর্ণনা ও চৈনিক দূতগণের বিবরণীতে চর্তুদশ ও পঞ্চদশ শতকে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্মরণাতীত কাল থেকে গ্রাম ছিল বাংলার অর্থনীতির মৌলিক অংশ। সুলতানী বাংলায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই ধরনের গ্রামই বর্তমান ছিল। ছোট গ্রামগুলোকে পাটক (পাড়া) বলা হত। আর বৃহৎ গ্রামগুলোকে বলা হত গ্রামস্।[৫] তবে স্থান ও কালভেদে গ্রামগুলোর আয়তন পরিবর্তিত হত। তৎকালীন গ্রামগুলোতে আবাসনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে রাস্তা-ঘাট, নদী-নালা, খাল-বিল, দুর্গ,

Dhaka University Institutional Repository

বন-জঙ্গল ইত্যাদি বিরাজমান ছিল। আবাদি ও অনাবাদি দুই ধরনের জমিই সেখানে ছিল। কিছু কিছু গ্রামে স্থানীয় হাট ও বাজার বসত যেখান থেকে স্থানীয় লোকেরা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করত।[৬] তাছাড়া গ্রামগুলোতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোক বসবাস করত, তার মধ্যে কৃষক, তাঁতী, জোলা (জুলহা), মৎসজীবী, স্বর্ণকার, কামার, কুমার, ছুতার, দর্জি, পান বিক্রেতা, ফুল বিক্রেতা, তেল বিক্রেতা, ধোপা প্রভৃতি পেশা উল্লেখযোগ্য। কৃষক সম্প্রদায় ছিল সুলতানী বাংলার গ্রামসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী। তাছাড়াও তাঁতী (জুলহা/ জোলা) শ্রেণীর লোকেরও কমতি ছিল না। সমকালীন বাংলা সাহিত্য প্রমাণ করে যে, সুলতানী বাংলার নগরায়ন বাংলায় তাঁতীশ্রেণী বিশেষ করে মুসলিম তাঁতী শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য তৈরি করেছিল এবং তারা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ।[৭] মাহুয়ান বাংলার পেশাজীবিদের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, physicians, astrologers, experts, in every art and craft,....all these they have[৮] এসব শ্রেণীর উপর গ্রাম্য অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব ও ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। জমিদার ছিল একটি সাধারণ শ্রেণীর নাম। সকল অভিজাতদেরকে জমিদার বলা হতো।[৯]

তৎকালীন বাংলার গ্রামগুলোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। মূলত ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণীরা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থনৈতিক সামর্থের ভিত্তিতেই এ শ্রেণীবিন্যাস প্রচলিত ছিল।[১০] গ্রামছাড়াও তৎকালীন বাংলায় সুলতানদের সফলতায় ব্যাপক নগরায়নের ফলে বিভিন্ন আয়তন ও গুরুত্বের শহর বর্তমান ছিল। এসব শহরগুলোতে মানুষ প্রশাসন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে একত্রিত হতো। কিছু কিছু শহর বাণিজ্যিক বা ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে বিবেচ্য হতো। ইবনে বতুতা ও চৈনিক দূতগণ এ রকম শহরের উপস্থিতির সাক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন।[১১] শহরগুলোর মধ্যে পান্ডুয়া, গৌড়, সোনারগাঁও, মুয়াজ্জমাবাদ, সাতগাঁও, ফতেহাবাদ ও চাঁটগাঁ গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত ছিল।

মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের ফলে এর অধিবাসীদের ভাগ্যের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ বিজয় কেবল বাঙ্গালিদেরকে একই রাজনৈতিক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করেনি এবং তাদের মধ্যে একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনেও সহায়তা করেনি বরং তা তাদের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছে। মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা এত দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করে যে বাংলা পৃথিবীর একটি অতি সম্পদশালী দেশ হিসেবে পরিচিত হয় এবং কৃষি ও বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়।

সুলতানী আমলের পূর্বে বাংলার অর্থনীতির যে চিত্র পরিলক্ষিত হয় সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো: পাল ও সেন আমলে ভূমিবান, মহওর, কুটুম্বও সাধারণ গৃহস্থেরা মোটামুটি স্বচ্ছল থাকলে ও ভূমিহীন গৃহস্থ ও সমাজ শ্রমিকদের যে কী দূরাবস্থা ছিল পুরান চর্যাপদ গীতি ও সদুক্তিকর্নামৃত থেকে তার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। একটি গীতিতে বলা হয়েছে "টিলাতে আমার ঘর, পাড়াপড়শি নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই; সারাদিন খিদেয়-ধুঁকছি।" অন্য জায়গায় বলা হয়েছে "শিশুরা ক্ষুধার্ত, তাদের দেহ কঙ্কালসার, বন্ধুবান্ধবেরা বিমূখ, পুরোনো ফুটোফাটা পাত্রে সামান্যই জল ধরে এসব ও আমায় তেমন কষ্ট দেয়নি; যেমন কষ্ট দিয়েছিল যখন দেখছিলাম আমার গৃহিনী ছেড়াঁ কাপড় সেলাই করার জন্য রাতে প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে ছুঁচ চাইছে।" আরও নির্মম ও নিষ্করুণ চিত্র হলো: "পরণে তার ছেঁড়া কাপড়, বিষন্ন শীর্ণ দেহ। খিদেয় শিশুদের চোখ গর্তে-ঢোকা, পেট পিট এক হয়ে গেছে; তারা খাবে বলে

Dhaka University Institutional Repository

কাঁদছে। দীন দুঃস্থ ঘরের বউ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে- এক মুঠো চালে যেন একশো দিন চলে। অন্য একটি শ্লোকে ঘরের বর্ণনা পাওয়া যায়- কাঠের খুঁটি নড়ছে-মাটির দেয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে; কেঁচোর সন্ধানে আসা ব্যাঙেরা আমার ভাঙ্গা ঘর ছেয়ে ফেলেছে।"[১২] মূলত, এসব সাধারণ মানুষের দুঃখ দৈন্য নিয়ে শাসকগণ এতটুকু মাথা ঘামাত বলে মনে হয় না। অথচ সুলতানী আমলের নগরায়নের ফলে কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য, বহু সংখ্যক পণ্যদ্রব্যের ব্যাপক রপ্তানী এবং মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে বাংলা খুবই সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। জিনিসপত্রের প্রাচুর্য্য ও সুলভতার জন্য সাধারণ শ্রেণীর শ্রমিকরাও ভাল খেতে ও স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারত।

১. মুদ্রা ও অর্থনীতি

প্রাচীনকালে বাংলায় দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল অর্থাৎ জিনিসের বদলে জিনিস দিয়ে লেনদেন হত। এটা খুব পিছিয়ে পড়া সমাজের লক্ষণ। বাংলায় মুদ্রার প্রচলন দেখা দেয় খ্রিস্টজন্মের আগে থেকেই। যদিও গুপ্ত আমলে বাংলায় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল কিন্তু সপ্তম শতকের পর থেকে বাংলায় স্বর্ণমুদ্রা একেবারে উধাও হয়ে যায়। সেন আমলে এসে রৌপ্যমুদ্রারও সন্ধান মেলে না। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনে বাংলা অনেকাংশে পিছিয়ে পড়ে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবনতির ফলে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাগুলোর অবনতি ঘটে। পাল রাজাদের আমলে স্থলপথে কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, সিকিম ও ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধুত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এমনকি ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গেও ব্যবসায়-বাণিজ্য করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তা যথেষ্ট সার্থক হতে পারেনি। ফলে, কৃষির উপর নির্ভরতা বাড়তে বাড়তে পাল আমলের শেষের দিকে এবং সেন আমলে বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

পুরোপুরি কৃষিনির্ভর ও ভূমিনির্ভর অচল অনড় গ্রাম্য সমাজে পরিণত হয়।[১৩] সেনামলে বহির্বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং গ্রামীণ অর্থনীতি জনজীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়িয়েছিল।[১৪] তাই মুদ্রার ক্ষেত্রে সুলতানী আমলে বাংলার নগরায়নের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট তাছাড়া বাংলার নগরায়নকে দ্রুততর করার ব্যাপারে এবং দূরবর্তী দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালু রাখার ক্ষেত্রে মুসলিম শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাব্যবস্থা ছিল একটি অত্যন্ত সক্রিয় প্রযুক্তি। তৎকালীন সময়ে ৯৬ রতি বা ১৭২.৮ গ্রেন মানের ওজনের ভিত্তিতে সোনা ও রোপার দ্বি ধাতু মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।[১৫]

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া ও গৌড় বিজয়ের পর গৌড় থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরির নামে স্মারক স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন করেন। এই মুদ্রাই ছিল বাংলা থেকে জারি করা প্রথম মুসলিম স্বর্ণমুদ্রা।[১৬] বাংলা থেকে মূলতঃ চার শ্রেণীর মুদ্রা প্রণয়ন করা হয়েছে -

ক. ওয়ালি বা ইক্তাদার দ্বারা জারি করা দিল্লীর সুলতানদের নামে মুদ্রা
খ. দিল্লীর নিয়োগপ্রাপ্ত ইক্তাদারদের মধ্যে স্বাধীনতাঘোষণাকারী ইক্তাদারদের নিজ নামের মুদ্রা,
গ.দিল্লীর সুলতান ও ইক্তাদারদের যৌথ নামের মুদ্রা এবং
ঘ.বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ।[১৭]

ক. বাংলায় নিযুক্ত ওয়ালি বা ইক্তাদারদের দ্বারা মুদ্রিত নিম্নোক্ত দিল্লী সুলতানদের নামযুক্ত মুদ্রা পাওয়া যায়। সুলতান মুইযউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম (১১৯৩-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান শামস্উদ্দিন ইলতুতমিশ (১২১০-১২৩৫ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান রুকনুদ্দিন ফিরুজ শাহ (১২৩৫-১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ), সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান বাহরাম শাহ (১২৪০-১২৪২

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টাব্দ), সুলতান আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ (১২৪২-১২৪৪ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান নাসরুদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ), সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ)। এদের মধ্যে সুলতান মুহাম্মদ বিন সাম ব্যতীত সকলেরই রৌপ্যমুদ্রা বাংলা থেকে মুদ্রিত হয়েছে। শুধু মুহাম্মদ বিন সাম, ইলতুতমিস, সুলতান রাজিয়া, আলাউদ্দিন মাসুদ, নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ও মুহাম্মদ বিন তুঘলকের নামে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে এবং একমাত্র মুহাম্মদ বিন তুঘলক স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র তিনটি ধাতুর মাধ্যমেই বাংলায় মুদ্রা প্রণয়ন করেন।[১৮]

খ. দিল্লীর সুলতানদের সাথে বাংলার কয়েকজন গভর্নর মুদ্রায় স্বীয় নাম মুদ্রণের অধিকার লাভ করেন। সুলতান ব্যতীত সকলেরই রৌপ্যমুদ্রা বাংলা থেকে মুদ্রিত হয়েছে। শুধু মুহাম্মদ বিন সাম, ইলতুতমিসের সঙ্গে ওয়ালী বা ইক্তাদার গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর, নাসিরউদ্দিন মাহমুদের সাথে গভর্নর ইউজবক, সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সাথে গভর্নর গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরের যৌথ নামযুক্ত মুদ্রা পাওয়া যায়। যৌথ নামীয় মুদ্রার মধ্যে সবই রৌপ্য মুদ্রা।[১৯]

গ. বাংলায় স্বাধীনতা ঘোষণাকারী ইক্তাদারদের মধ্যে আলী মর্দান খলজি প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর ১২১০-১২১১ খ্রিস্টাব্দে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। তার স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় প্রকার মুদ্রা পাওয়া গেছে। ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের বাংলা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার এই স্বাধীনতা অক্ষুন্ন ছিল। এ সময়ে যে কয়েকজন সুলতান নিজ নামে মুদ্রা মুদ্রণ করেন তারা হলেন-বুগরা

Dhaka University Institutional Repository

খানের পুত্র কায়কাউস, সুলতান শামসুদ্দিন ফিরূজশাহ এবং তার দুই পুত্র নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিম ও গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর ।[২০]

ঘ. ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ প্রথম সোনারগাঁয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সোনারগাঁও টাকশাল থেকে স্বনামে মুদ্রা জারি করেন, এবং সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের মুদ্রা বিভিন্ন টাকশাল থেকে পাওয়া যায়। টাকশালগুলো হলো-সোনারগাঁ, জান্নাতাবাদ, ফিরোজাবাদ ও মুয়াজ্জেমাবাদ।[২১] হোসেনশাহী বংশের চারজন শাসক-আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩- ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ), নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ), আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ (১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) ও গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ) এর নামেই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। শাসকগণ সাধারণত কেন্দ্রীয় শহরগুলোর নিয়মিত দাপ্তরিক টাকশাল ও সাময়িক টাকশাল থেকে এসব মুদ্রা মুদ্রণ করতেন।[২২]

উল্লেখিত সুলতানগণ প্রণীত মুদ্রার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় প্রকার মুদ্রা বাংলায় উপস্থিত ছিল যা ছিল বাংলার নগরের প্রত্যক্ষ প্রভাব। মুসলিম শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে নিশ্চিতরূপে যথার্থ অগ্রগতি লাভ করে। মুসলিম আমলে ব্যাপকভাবে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন দেখা দেয় যা ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুসলিম আমলে স্বর্ণও রৌপ্য মুদ্রার এত ব্যাপক ব্যবহার ছিল যে, সাধারণ প্রজারা পর্যন্ত এ সময় মুদ্রায় খাজনা দিত।[২৩] তাছাড়া বাংলার সুলতানরা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করে শুধুমাত্র অন্যান্য মুসলিম শাসকদেরকেই উৎসাহিত

করেনি বরং বিশ্বের অন্যান্য অংশের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিল।[২৪]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে মুসলমান শাসনের শুরু থেকে শাসকগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেন, যা মুসলমান আমলে অর্থনৈতিক উন্নতির সাক্ষ্য দেয়।[২৫] জানা যায় যে প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলায় কোন মুদ্রার প্রচলন ছিল না, যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, এমনকি তাম্রমুদ্রারও প্রচলন থাকতো, তাহলে রাজা লক্ষ্মণসেন কড়ির পরিবর্তে যে কোন মুদ্রায় উপহার প্রদান করতেন।[২৬]

মূলত, সুলতানী শাসনে বাংলায় যে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে তাকে আমরা ভারতের মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।[২৭] কারণ এ সময়ে সুলতানগণের মুদ্রার প্রচলনের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে বেশ কিছু শহর ও বন্দরের বিকাশে ব্যবসায়-বাণিজ্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ছড়িয়ে পড়েছিল, যা বাংলার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[২৮]

২. অর্থনীতিতে কৃষির অবদান

উর্বর ভূমি, অসংখ্য নদ-নদী ও অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষিকাজে সহায়ক হওয়ায় বাংলা একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিকাজ করেই বেশির ভাগ জনসাধারণ জীবিকা নির্বাহ করত। বাংলায় বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদিত হত। তৎকালীন সময়ের গ্রীষ্মকালীন (খারি) ও বসন্তকালীন (রবি) শস্যের বর্ণনা রয়েছে। পর্যটক ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন যে "একই স্থানে দুটি সময়ের শস্য হত"।[২৯] এ সময়ে প্রধান প্রধান উৎপাদিত ফসলের মধ্যে রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

ধান, গম, বার্লি, যব, তিল ইত্যাদি। সুলতানী শাসকরা কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও নানাভাবে তাদের উৎসাহিত করেন। ফলে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলা বহুমাত্রিক রূপ লাভ করে। আবুল ফজল বলেন যে "যদি প্রত্যেক প্রকারের একটি করে শস্যকণা সংগ্রহ করা হত তাতে একটি বড় কলস ভরে উঠত। [৩০]

চর্তুদশ শতকের বাংলার কৃষি, অর্থনীতি ও জনজীবন উল্লেখ করে চীনা পর্যটক Wang Ta Yuan (১৩৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দ) বলেন যে, বেহেশতের ঋতু যেন এ রাজ্যে ছড়ানো হয়েছে, এখানকার লোকদের সরলতা ও প্রাচুর্য্য সম্ভবত চিও চিয়াং (পালেমবার্গ) ও ওচাও ওয়া (জাভা) এর মত। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলার জমিসমূহ এতই উর্বর ছিল যে বছরে তিনটি ফসল সেখানে জন্মাত।[৩১]

তৎকালীন সময়ে বাংলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হত । তাছাড়া বাংলা থেকে বিভিন্ন দেশে চাল রপ্তানি হতো। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশ সিংহল, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কুইলন ও মালদ্বীপ বাংলা থেকে সরবরাহ করা চালের উপর নির্ভরশীল ছিল। বাংলার কৃষিকার্যের প্রক্রিয়ায় উন্নত পর্যায়ের প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ধান-চালের পরিমান বৃদ্ধি পায়, ফলে দূরবর্তী অঞ্চলের সাথে খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপক বাণিজ্য করা সম্ভব হয়েছিল। পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলায় আগমনের সময় নদীর (মেঘনা/সুরমা) নদীর উভয় তীরে জলচক্র (water wheel) প্রযুক্তি সক্রিয় অবস্থায় দেখেছিলেন। মূলত সুলতানী আমলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে চালের উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যান্য পর্যায়ে প্রযুক্তির প্রয়োগ করা হয়েছিল।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সময়ে অধিক সংখ্যায় জলচক্র ও লিভার যন্ত্রগুলি (চাপযন্ত্র) ব্যবহারের ফলে এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত কৃষক-মজুরের সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষিজপণ্যের বিশেষ করে ধান চালের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল।[৩৩] সরু মোটা নানা ধরনের চাল এ দেশে উৎপন্ন হত।

এ দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হত। মুসলিম শাসনামলে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন ও বিপণনে মুসলমান শাসকদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলে পাট, তুলা, গুড়, মোটা চিনি, রেশমজাত দ্রব্য দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিভিন্ন বন্দর নগরীর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হত। মুসলিম আমলের এসব কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানী প্রক্রিয়ায় শাসকদের অবদান বিবৃত হল:

সুলতানী আমলে যেসব কৃষিজপণ্য ব্যাপক পরিমাণে রপ্তানি হতো তন্মধ্যে ইক্ষু, তুলা, মরিচ, সরিষা ও পাট ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। এদেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে এসব পণ্যের উৎপাদনও রপ্তানি বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। গুটিপোকার চাষ মুসলিম শাসনামলের উৎপাদিত ও রপ্তানিকৃত অন্যান্য একটি পণ্য। পঞ্চদশ শতকে এই প্রদেশে ভ্রমণকারী চৈনিক দূতদের বর্ণনায় এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৪] এটা উল্লেখ করা যায় যে, গুটি পোকার চাষ হিন্দু আমলে ভারতবর্ষে অপরিচিত ছিল। মুসলিম শাসনামলে প্রথম যুগে সম্ভবত চীনদেশ থেকে বাংলায় এটা আমদানি করা হয়।[৩৫] তুঁতগাছ ও রেশম চাষ ছিল সুলতানী আমলের আরেকটি অন্যতম সফল কৃষিজ পণ্য। মূলত, মধ্য ও উত্তরবঙ্গে এ গাছ ও পোকার চাষ হত। চীন হতে সুলতানী আমলে প্রথম এটি বাংলায় আমদানি হয়।[৩৬] মুসলিম শাসকরা তুঁতগাছ ও গুটিপোকা চাষে ব্যাপক উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করত। বার্থেমা উল্লেখ করেন যে," বাংলায় তুলা, আদা, চিনি, শস্য ও সবরকম পশু প্রচুর পরিমাণে

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যেত এবং ঐগুলোর প্রাচুর্য্য থাকার দরুণ বাংলা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ ছিল।" [৩৭]

আলোচ্য সুলতানী আমলে পশুপালন ও পশুচারণ ছিল গ্রাম বাংলার একটি জনপ্রিয় পেশা। তন্মধ্যে গরুপালন ছিল মূখ্য। প্রধানত গোরব ও হালের কাজে গরুর ব্যবহার বেশী ছিল। অন্যান্য গবাদি পশুর মধ্যে উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, ছাগল, কুকুর ও বিড়াল উল্লেখযোগ্য।[৩৮] ইবনে বতুতার বর্ণনানুসারে, গবাদি পশু ও পাখির মধ্যে মহিষ, ভেড়া, গরু, মুরগী ও কবুতর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছিল। [৩৯]

মূলত কতিপয় বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রকাশ পায়। প্রথমত : কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য, দ্বিতীয়ত : প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতা, তৃতীয়ত : ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্য এবং চতুর্থতঃ দেশে স্বর্ণ ও মূল্যবান পদার্থের প্রাচুর্য্য। সমসাময়িক ফারসি ঐতিহাসিক ও বিদেশী পরিব্রাজকদের বর্ণনায় দেখা যায় যে, মুসলিম শাসনাধীনে বাংলা উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে সমৃদ্ধির এই চারটি প্রয়োজনীয় জিনিসের অধিকারী ছিল যা কেবলমাত্র মুসলমান শাসক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যাপক নগরায়নের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

৩. অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান

মুসলমান শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ শিল্পকারখানা ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির। শুধুমাত্র নিজেদের ব্যবহারের প্রয়োজনে অল্প কিছু দ্রব্যাদি তৈরি হতো। গ্রাম বা শহর নির্বিশেষে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে থাকে। গ্রামের নিত্যপ্রয়োজনে বিভিন্ন ফুটির শিল্পজাতদ্রব্যাদি তৈরী হতো। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলমানদের পর্যায়ক্রমিক আগমন এই

Dhaka University Institutional Repository

ধারার পরিবর্তন ঘটেছিল। এ পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ হল সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ, নগরায়নের শুরু, বিভিন্ন ধরনের নগরকেন্দ্রের উত্থান, নতুন শিল্পকৌশল ও প্রযুক্তি, বিদেশী বণিকদের আগমণের ফলে বিভিন্ন দ্রব্যাদির চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।

সুলতান ও অভিজাতদের অধীনে যেসব কারখানা (workshop) ছিল সেগুলো তৎকালীন সময়ের শিল্পকারখানা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এ কারখানাগুলো ধীরে ধীরে এ অঞ্চলের শিল্পপ্রতিষ্ঠান তৈরীর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। বারানী উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন দ্রব্যাদি তন্মধ্যে প্রধানত সামরিক সরঞ্জামাদি, অভিজাতদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এসব কারখানায় তৈরী হত।[৪০]

৩.১ বস্ত্র শিল্প

বস্ত্র শিল্প বাংলায় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। নবম দশকের আরব-বণিক সুলায়মান বলেন, তৎকালীন পূর্ব ভারতে তুলা শিল্পের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সমসাময়িক উৎস থেকে পাওয়া যায় যে, বস্ত্র শিল্প সেই সময় গতিশক্তি এবং নতুন মাত্রা পায়। মার্কো পোলো (১২৭১-১২৯৪) লিখেছেন যে, বাংলায় অধিক পরিমাণে তুলা উৎপাদন হতো এবং এর বাণিজ্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের পতনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পূর্বে মালাক্কায় ও পশ্চিমে ক্যাম্বের উত্থান বস্ত্র শিল্পের উন্নতির অন্যতম নিয়ামক। তৎকালীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিপথ পারস্য উপসাগর থেকে পরিবর্তন হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া-এ্যাডেন-ক্যাম্বে-মালাক্কা দিগন্তে গড়ে ওঠে।[৪১]

চরকার ব্যবহার বস্ত্র প্রস্তুত ত্বরান্বিত করে এবং প্রচুর পরিমাণ কাপড় তৈরী করে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের অংশগ্রহণে নতুন পেশাগত শ্রেণী

Dhaka University Institutional Repository

তৈরী হয় যাদের জোলা/ জুলাহা (তাঁতী যারা কাপড় বোনো) বলা হতো।[৪২] সময়ের ব্যবধানে এই শিল্প বিভিন্ন ধরনের কাজ যেমন, নিপূণ কাপড় তৈরী, মাকু, স্পিনিং, সুতা পেঁচানো, ডিজাইনার, শিল্পীর বিভিন্ন জাত ও উপজাত তৈরী হয়েছিল।[৪৩] শিহাবউদ্দিন আল উমরি উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কারখানায় সোনা বা রুপায় কারুকার্যখচিত এবং নকশি করা পোশাক প্রস্তুত হতো। কিছু পরিমাণ পছন্দের দ্রব্যাদি অভিজাত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান তন্মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে তৈরী হতো।[৪৪] যা জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করতো এবং বহি:বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত না হলেও কৃষিদ্রব্যাদি বাজার অর্থনীতির শুরু এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে শিল্পদ্রব্যাদির পরিমাণ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৪৫]

সুলতানী আমলে বাংলার নদী তীরবর্তী শহর, বন্দরগুলো ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য নির্ভর জাকালো ও ধন ঐশ্বর্যে ভরপুর। এ ব্যবসায়-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বড় বড় শহর গড়ে ওঠে। যেমন লখনৌতি, সোনারগাঁও ও চাটগাঁ।[৪৬] এ সব অঞ্চলে কিছু শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছিল। বাংলায় সুতিবস্ত্র তৈরীর শিল্পকারখানা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূণ শিল্প। চৈনিক বিবরণে ছয় প্রকার সুতিবস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন পি-পো, মানচেত, শাহ-না-কিয়ে, হিন পেই-টাঙ্গ-টা-লি, শা-তা-ইউল, মা-হেই-মা-লি।[৪৭] পঞ্চদশ শতকের পর্তুগীজ পর্যটক তোমো পিরেস (Tome Pires) বাংলার রপ্তানির জন্য সাত রকম সুতিবস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন সিনাবাফো (sinabafos) চৌতর (chautares) বয়াতিলহা (beatilhas)ও বেইরাম (beirame)।[৪৮] এসব কাপড়ের মধ্যে 'বিয়াতিলহা'কে মমতাজুর রহমান তরফদার এক প্রকার মসলিন কাপড় বলে উল্লেখ করেছেন। এ বস্ত্রের খুব চাহিদা ছিল। মালাক্কায় এসব বস্ত্র খুব চড়া

Dhaka University Institutional Repository

দামে বিক্রি হত।[৪৯] বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যে অনন্য এ সকল উন্নত কাপড়ের কোন প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলনা। আকার গুনাগুণ ও রঙের বৈচিত্রে খ্যাত এ সকল কাপড় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বণিকগণ রপ্তানি করতো। তৎকালীন সময়ে বণিকরা এত বিত্তবান ছিল যে তাদের গৃহে সোনা, রুপা ও মূল্যবান সামগ্রী বহুল পরিমাণে পাওয়া যেত।[৫০] মুসলিম শাসনামলে বাংলা পৃথিবীর সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। 'মসলিন' নামে পরিচিত সবচেয়ে উন্নতমানের বস্ত্রের সারা বিশ্বে খ্যাতি ছিল।[৫১] এমনকি বিদেশী রাজা ও অভিজাত ব্যক্তিগণ এর সমাদর করতেন। যা কিনা সুলতানগণের আন্তরিত পৃষ্ঠপোষকতায় ও নগরের সমৃদ্ধির ফলেই সম্ভব হয়েছিল। বয়ন শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার উৎপাদনও রপ্তানীতে বাংলা শীর্ষস্থানে ছিল। বন্দর থাকার সুবিধার জন্য বাংলা বহির্জগতের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং বিরাট বস্ত্র শিল্প গড়ে তুলেছিল।[৫২] বাংলার বয়ন শিল্প প্রসঙ্গে বার্বোসা (১৫১৬-১৫১৮) বলেন "এদেশে প্রচুর সুতা আছে, তারা সূক্ষ ও মিহি অনেক প্রকারের বস্ত্র তৈরি করে। এসব বস্ত্র তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য রঙ্গীন করে এবং ব্যবসায়ের জন্য সাদা রাখে। এগুলো খুবই মূল্যবান কাপড়। [৫৩]

বিদেশী পর্যটকগণ তাদের বিবরণে বাংলার কাপড়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বাংলার শাসনকর্তা বুগরা খান তার পুত্র কায়কোবাদকে উপহার হিসেবে যে কাপড় দেন আমীর খসরু তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এছাড়াও তিনি সোনার সুতোয় কারুকার্য করা টুপি ও রেশমী রুমালের উল্লেখ করেছেন। [৫৪]

বার্বোসা (১৫১৬-১৫১৮) তাঁর বিবরণে বাংলার তৈরি 'শিরবন্দ' নামে এক রকম কাপড়ের প্রসঙ্গে বলেন যে, ইউরোপীয় মহিলাদের কাছে মাথার স্কার্ফ হিসাবে উক্ত কাপড়ের খুব কদর ছিল। আরব দেশীয় বণিকদের কাছে বাংলার 'সিনবফ'

Dhaka University Institutional Repository

কাপড় ও খুব পছন্দসই ছিল। এই কাপড় দিয়ে তারা কামিজ বানাত। বাংলার নিজস্ব চাহিদা ছিল সূতী, রেশমীর ধূতী ও শাড়ী। কাজেই এগুলো প্রচুর পরিমাণে তেরী হত।[৫৫] বার্থেমা বলেন যে, ক্যাম্বে বন্দরে প্রতি বছর ৩০০ জাহাজ আসত। তন্মধ্যে বাংলা হতে ৫০টি জাহাজ সূতি ও রেশমী কাপড় নিয়ে আসত। [৫৬]

মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন জাতের বণিক বাংলায় আগমন করে ও নিজেকে ব্যবসায় সম্পৃক্ত করে। চীনা পরিব্রাজক দল পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় ভ্রমণ করেন এবং তাঁরা দেখেন যে, চট্টগ্রাম বন্দর, সোনারগাঁ ও পান্ডুয়া রাজধানী শহরের মুসলমানগণ ব্যবসায়- বাণিজ্যের সাথে জড়িত। [৫৭] সিল্কের কাপড় ছিল মুসলমান আমলের সবচেয়ে সস্তা শিল্প। মুসলমান আমলের পূর্বে এগুলো এত ব্যাপকভাবে উপস্থিত ছিল কিনা এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানা না গেলেও সুলতানী আমলেই যে এই শিল্পের বিকাশ সাধিত হয়েছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[৫৮]

৩.২ কুটির শিল্প

গার্হস্থ্য শিল্পের মধ্যে বস্ত্র বয়ন ছিল সুলতানী বাংলার প্রধান পেশা। কামারেরা লোহা গলিয়ে বিভিন্ন অস্ত্র-সস্ত্র ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করত।[৫৯] স্বর্ণকারেরা স্বর্ণ ও রৌপ্য গলিয়ে দামী ও দৃষ্টিনন্দন অলংকার তৈরি করত।[৬০] তাছাড়া অপরিশোধিত চিনি, তেল, মদ, স্পিরিট ও সুগন্ধী তৎকালীন আমলে বাংলায় গৃহস্থালিতে তৈরী হত। সমসাময়িক চৈনিক বর্ণনামতে মদ ও স্পিরিট নারিকেল, চাল ও জলজ উদ্ভিদ থেকে তৈরি হত। [৬১]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ ধাতব শিল্প

বাংলায় সুলতানী আমলে ধাতব শিল্প ক্রমোন্নতি লাভ করেছিল। এসব ধাতব শিল্পের মধ্যে লোহা, ব্রোঞ্জ, দস্তা, তামা, সোনা ও রুপা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তারা দৈনন্দিন ও কৃষিজ যন্ত্রপাতি তৈরী ও বিপণন করত। এসবের মধ্যে বেসিন, কাপ, ছুরি, কাঁচি রান্নার সামগ্রী উল্লেখযোগ্য ছিল। এই সময়ে লোহা দ্বারা তৈরি সরঞ্জামাদির ব্যবসা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরকারের প্রয়োজনীয় অস্ত্র-সস্ত্র প্রধানত এ সময়ে বেশী তৈরী হত। চৈনিক দূতের বর্ণনানুসারে তৎকালীন প্রাসাদসমূহের দেয়ালগুলো পিতল দ্বারা মোড়া ছিল।[৬২]

ত্রয়োদশ শতকের প্রাথমিক পর্যায়ে চৈনিক উৎস থেকে জানা যায় যে, পাং-কো-লা (বাঙ্গালা) এর নিজস্ব উৎপাদন ছিল এক ধরনের ধারাল অস্ত্র। ঘণ্টা (বেল) এবং লোহার আংটা ঘোড়ার গলায়, নাকে নিতম্বে ব্যবহার করতো। তিনি আরও বলেন–ধারালো অস্ত্র তৈরিতে ত্রিহুতে তিনজন দক্ষ ব্যক্তি ছিল। বিভিন্ন কারণে মুসলমানদের আগমণের পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ধাতব শিল্পের ব্যাপক গতির সঞ্চার হয়। প্রথমত: নতুন সেনাদল/অশ্বারোহীর ঘোড়ার খুরের জন্য অশ্বপাদুকা, অশ্বারোহীর পা রাখার জন্য লোহার পাদানী এবং ঘোড়ার পিঠে বসার জায়গা দরকার হতো। সন্দেহাতীতভাবে সামরিক সরঞ্জামাদি যেমন-ধারালো অস্ত্র, অশ্বারোহীর পা রাখার জন্য পাদানী ও ঘোড়ার পিঠে বসার জায়গা ও বর্ষা/বল্লম প্রভৃতি ধাতব শিল্পীদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এনে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত: সাধারণ মুসলিমরা এবং বিশেষকরে অভিজাত শাসক শ্রেণী বহু মূল্যবান ধাতু দিয়ে তাদের রুচি সম্মত দ্রব্যাদি তৈরী করতেন।[৬৩]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ কাগজ শিল্প

মুসলমানরা বাংলায় কাগজের ব্যবহার শুরু করে। মাহুয়ান বাংলায় কাগজ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, "তারা এক ধরনের গাছের বাকল থেকে সাদা কাগজ তৈরি করে যা হরিণের চামড়ার মতো মসৃণ এবং উজ্জ্বল।[৬৪] বাংলায় কাগজের ব্যবহার হুন্ডি ব্যবস্থাকে সহজতর করার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া সামরিক শাসনকর্তা ও রাজস্ব সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত কর্মচারিগণ সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারত। অন্যদিকে কাগজ ব্যবহারের ফলে সরকারি পত্রাদি প্রেরণ ও সিল ব্যবহার সহজতর করতে পেরেছিল। সুলতানদের যোগাযোগের এই পদ্ধতি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলেছিল।[৬৫] সুলতান হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৪-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) একডালা দূর্গে তিন খন্ডে সহীহ বুখারীর অনুলিখনের কাজ এবং নুসরত শাহের রাজত্বের (১৫৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দ) শেষ বছরে গৌড়ে ইরানী রীতিতে নিজামীর শরফনামার কয়েকটি অনুকাহিনীর চিত্রণ পনের ও ষোল শতকে বাংলায় কাগজ ব্যবহারের স্পষ্ট প্রমাণ দেয়।[৬৬]

৩.৫ চামড়া শিল্প

চামড়া শিল্প সুলতানী বাংলার শিল্পগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম শিল্প ছিল। মো: আখতারুজ্জামান উল্লেখ করেছেন যে, তিব্বতীয়রা চামড়ার জুতা ব্যবহার করতো। তাছাড়া কাঠের/চামড়ার গোড়ালী সংযুক্ত বিভিন্ন ধরনের জুতার কথাও বলেছেন যাদের বলা হতো *পা-নি-হি* (upanah)। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুঝা যায় যে সুলতানী আমলের প্রাথমিক দিকে বাংলায় চামড়ার ব্যবহার ছিল। চতুর্দশ শতকে চামড়া শিল্প বিভিন্ন কারণে আরো প্রসিদ্ধি/সমৃদ্ধি লাভ করে যেমন, মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে পশু জবাই থেকে অধিক

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাণে চামড়া ও হাড় পাওয়া যেত। মুসলমানদের আগমণের ফলে ভারতে পশু জবাই প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় কারণ তাদের খাদ্যাভ্যাসে নিরামিষ ভোজী ছিল না। মুসলমানদের খাদ্যাভাস এবং পশু শিকারের প্রতি দুর্বলতা ছিল আরও একটি কারণ। তৎকালীন বাংলায় লবণ খুব সস্তা ছিল এবং চামড়া প্রক্রিয়াকরণে লবণ খুবই দরকারী বলেই বাংলার চামড়া শিল্প উন্নয়নে সহায়তা করেছিল। [৬৭]

মার্কো পোলো (১২৭১-১২৯৪) লিখেছেন যে, মুসলামানরা তাদের পোশাকে বিভিন্ন ধরণের চামড়া ব্যবহার করতো যেমন ছাগলের চামড়া, ষাড়ের চামড়া, মহিষের চামড়া, বুনো ষাড়ের চামড়া এবং এক শিং ওয়ালা অশ্ব সদৃশ প্রাণী বিশেষ ও অন্যান্য প্রাণীর চামড়া ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে প্রতি বছর জাহাজে করে চামড়া আরব দেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানী করা হতো। তিনি আরও বলেন যে, চামড়া দিয়ে আরব মুসলমানদের ঘুমানোর জন্য সুন্দর পাটি তৈরী করতো। *ফুতুহাত-ই-ফীরূজ শাহী*তে উল্লেখ রয়েছে যে, সুলতান ফীরূজ শাহ তুঘলক এর শাসন আমলে পশু শিকারের জন্য সামরিক বাহিনী হাড় দিয়ে বিভিন্ন অস্ত্রাদি তৈরী করেছিল। এছাড়া চামড়া দিয়ে জুতা, বেগ, কার্পেট, পানির পাত্র প্রভৃতি তৈরী হতো। মাহুয়ান ও বার্বোসার উদ্ধৃতি থেকেও চামড়ার বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। মার্কো পোলো আরও বলেছেন যে, চামড়া ধীরে ধীরে রপ্তানি দ্রব্যে পরিণত হয় এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলা অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করতে সক্ষম হয়।[৬৮]

৩.৬ মৎস্য শিল্প

বাংলা নদীমাতৃক দেশ। নদীবহুল এদেশে অধিকসংখ্যক নদী, পুকুর, খাল ও বিল ছিল বলে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা হত। ফলে মৎস্য শিল্প বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভবদেব বাট বলেছেন, হিন্দুরা মৎস্য ভক্ষণের অনুমতি গ্রহণ করেছিল। বিদ্যাপতি, জৌনপুর শহরে মাছের বাজার সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং মালিক মোহাম্মদ জায়সি তার পদুমাবত গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের মাছের কথা উল্লেখ করেছেন যা দ্বাদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে মাছের চাহিদা ও বাণিজ্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে। ইবনে বতুতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় যে, বড় মাছ ভর্তি একটি জাহাজ সোনারগাঁ থেকে মালদ্বীপে নিয়ে এসেছিল যা বারাহনগর (আরাকান সমুদ্র তীরবর্তী একটি শহর) রাজাকে প্রদান করা হয়েছিল।[৬৯] এটা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার জেলেরা গভীর সমুদ্রে মাছ শিকার করত এবং ব্যবসায়ীরা তা বাজারজাত করতো। ভবদেব বাটের উদ্ধৃতি থেকে 'শুটকি মাছ' ও বার্নিয়ারের উদ্ধৃতি থেকে বাঙালীরা যে লবণাক্ত মাছ ইউরোপীয় জাহাজে সরবারাহ করতো তা প্রমাণ পাওয়া যায়। এ থেকে আরও বুঝা যায় যে, বাংলার জেলে ও ব্যবসায়ীরা মাছ সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতো। মাছ সংরক্ষণের একমাত্র উপাদান ছিল লবণ যা খুবই সস্তা ও প্রতুল। পরবর্তীতে মসলা মাছ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হতো। লবণাক্ত মাছ রোদে শুকিয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা হতো। এটা বলা গুরুত্বপূর্ণ যে, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাহিদা মুসলিম বাংলার প্রাথমিক দিকের মৎস্য পেশাজীবিদের (dhivara/jalika) ভাগ্য উন্নয়ন করেছিল।[৭০]

তৎকালীন বাংলায় প্রধানত দুটি কারণে নৌকা ও জাহাজ তৈরীর কারখানা খুবই গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রথমত: বাংলায় অসংখ্য নদ-নদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ত: সুলতানী শাসন আমলে বাংলা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে সংযুক্ত ছিল। তৎকালীন বাংলার তিন ধরনের জলযানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়- যেমন, ছোট নৌকা, রণতরী (ফ্রোটিলা) এবং যাত্রী ও বণিকবাহি বড় জাহাজ।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের নৌকা এবং জাহাজ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলায় প্রস্তুত হতো।

ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, "তখন অসংখ্য নৌকা ছিল এবং প্রতিটিতে একটি করে দাস থাকতো। যখন একটি নৌকা অপর নৌকার সম্মুখবর্তী হতো একজন নাবিক আর একজন নাবিককে অভিনন্দন জানাতো। সিহাবউদ্দীন আল-উমরী উল্লেখ করেন যে, মোহাম্মদ বিন-তুঘলক (১৩২৫-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ) যখন বাংলা জয় করেন তখন লখনোতির গঙ্গা নদীতে দুই লক্ষ ছোট বড় নৌকা চলাচল করতো। যতদূর সম্ভব এগুলো ছিল নৌবাহিনীর রণতরী।[৭১] মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার তিন থেকে চারশ বছর পর চীনা জাহাজকে বলা হত জাংক (junk) এবং আরবীয় জাহাজকে বলা হত 'ধো' (dhaw)।

৩.৭ পাথর ও ইট শিল্প

সুলতানী বাংলার নগরায়নের ফলে বাংলায় পাথর ও ইট শিল্প বিকাশ লাভ করেছিল। বাংলার কারিগরেরা এ দুটি শিল্পে বিশেষ দক্ষতা ও খ্যাতি লাভ করেছিল।[৭২] ইলিয়াস শাহী যুগের (১৪৩৬-১৪৮৭) প্রথম দিকের অভিলিখন থেকে প্রমাণিত হয় যে, পাথর খোদাই শিল্পে বাংলা তখন ব্যাপকভাবে অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান ছিল। ইট ও পাথর দ্বারা তখন দালানকোঠা, মসজিদ ও প্রাসাদ তৈরী হত।[৭৩]

সুলতানী বাংলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল মাদুর শিল্প। বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যে লোহিপাটি বা লাল মাদুর ও শীতলপাটি বা ঠান্ডা মাদুর সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়।[৭৪] মাদুর তৎকালীন সময়ের বিলাস পণ্যের তালিকায় স্থান লাভ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮ চিনি শিল্প

মুসলমান আমলে চিনি উৎপাদন একটি প্রধান শিল্পে উন্নীত হয়। বাংলায় ইক্ষুর উৎপাদন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। দেশে ও বিদেশে বিক্রয়ের জন্য তৈরি শিল্পজাত পণ্যগুলোর মধ্যে বস্ত্রের পরেই ছিল চিনির অবস্থান। পনের শতকের প্রথমদিকে মাহুয়ান এদেশে তিন ধরনের চিনি দেখেছিলেন। এগুলো হচ্ছে কণাসমষ্টির আকারে তৈরি চিনি (গুড়) বা granulated sugar, সাদা চিনি বা white sugar এবং দানাবাধা চিনি (মিসরি) বা crystallized sugar.[৭৫] কণার আকারে গুড়ের দানা বাঁধানো, চিনির গুড়ে শুভ্রতা আনায়ন ছিল নিঃসন্দেহে সূক্ষ্ম প্রকৌশলগত প্রযুক্তির প্রয়োগ।

বার্বোসা বলেন যে, তিনি এ প্রদেশে ব্যাপক ইক্ষুর চাষ দেখেছেন, বাংলার এ শিল্প সম্পর্কে তিনি আরো বলেন যে "অত্যন্ত ভাল মানের সাদা চিনি এ শহরে (বাঙ্গালা) তৈরি হয়.....এ পণ্য তারা বহু জাহাজ বোঝাই করে এবং সর্বত্র বিক্রির জন্য রপ্তানি করে।[৭৬] ইবনে বতুতার বর্ণনায় বাংলায় চিনি শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। বার্থেমার বর্ণনাতেও বাংলায় চিনি শিল্পের প্রাচুর্য্যতার বর্ণনা পাওয়া যায়।[৭৭] মুসলমান শাসকগণ চিনি রপ্তানিতে সরাসরি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের দেশসমূহে এবং পারস্য উপাসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে বাংলার ব্যাপক রপ্তানি বাণিজ্য ছিল। এমনকি ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে এই প্রদেশ শতকরা ৫০ ভাগ লাভে ৫০,০০০ মণ চিনি রপ্তানি করেছিল।[৭৮]

৩.৯ লবণ শিল্প

বাংলার লবণ শিল্প বেশ উন্নত ছিল। এ শিল্পের সঙ্গে কিছু প্রযুক্তি জড়িত ছিল। বাংলার চট্টগ্রাম থেকে কাটাক (উড়িষা) পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলের লবণকণা

Dhaka University Institutional Repository

সমৃদ্ধ মাটিতে লবণ উৎপন্ন হতো। সূর্যতাপের সাহায্যে লোনা জলের বাষ্পীভবনের মাধ্যমে এবং ঘনীভূত লোনা জল সিদ্ধ করে লবণ তৈরির প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। এ দুই পদ্ধতিতে প্রস্তুত লবণকে বলা হত যথাক্রমে কুরকুচ লবণ ও পুঙ্গাহ লবণ। পুঙ্গাহ লবণের ব্যবহার বেশী ছিল।[৭৯] এজন্য এ জাতীয় লবণের উৎপাদন ছিল ব্যাপক ও প্রচুর।

সুলতানী আমলে বাংলায় কতগুলো বিলাসদ্রব্য তৈরির প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ। চীনা পর্যটক মাহুয়ান বাংলায় ব্যবহৃত চার রকমের মদের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, "বিভিন্নভাবে তৈরি মদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল চোলাই করা (mostly they have distilled wines)"।[৮০] আবুল ফজল বর্ণনা করেন যে, "মদ তৈরির জন্য যে তিন রকমের পাতন প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হতো নলযুক্ত পাত্রগুলো আসলে বিভিন্ন ধরনের বকযন্ত্র।"[৮১]

মূলত দিল্লী থেকে বাংলায় আগত বিভিন্ন তুর্কি শাসকদের সঙ্গে এই প্রযুক্তি বাংলায় চলে এসেছিল। ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে একটি চীনা বিবরণ থেকে জানা যায় যে "গৌড়ের রাজসভায় চীনা অতিথিদেরকে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে গোলাপ জল ও নানা ধরনের সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত শরবত দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়েছিল।"[৮২] এসব প্রযুক্তিগত কৌশলগুলো মুসলমান আমলের উদ্ভাবন।

৩.১০ জাহাজ নির্মাণ শিল্প

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলার গৌরবজনক ঐতিহ্য ছিল। যাতায়াত, অভ্যন্তরীণ ব্যাবসায়-বাণিজ্য, নদীবহুল দেশে নৌ-যুদ্ধ ইত্যাদির জন্য বাঙ্গালী কারিগরেরা হিন্দু যুগ থেকে ছোট বড় নানা আকারের নৌকা নির্মাণ করত। মুসলিম আমলে নৌ-যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের

Dhaka University Institutional Repository

অভূতপূর্ব উদ্দীপনার ফলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প খুব বেশী সম্প্রসারিত হয়। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বাঙ্গালি বণিকেরা মুসলিম শাসনামলে নানা ধরনের বৃহৎ ও দ্রুতগামী নৌকা নির্মাণ করতো। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান শাসনামলে এই প্রদেশের বণিকদের জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যকলাপ প্রতিফলিত হয়েছে। জাহাজের অগ্রভাগ কুমিরের মাথা ও সিংহের মাথার মতো। এরূপ ১০০ গজ দীর্ঘ ও ২০ গজ প্রস্থের জাহাজে গৌড়ের ধনপতি সওদাগর ও তাঁর পুত্র শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রার কাহিনী কবি মুকুন্দরাম লিপিবদ্ধ করেছেন।[৮৩] বাংলার জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সমৃদ্ধি সম্পর্কে মনসামঙ্গল কবিতায় ও উল্লেখ রয়েছে।

মূলত, বাংলার সুলতানদের পৃষ্টপোষকতায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। পর্যটক ট্যাভারনিয়ারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে "ঢাকার নদীতীরে দুই ক্রোশ স্থান জুড়ে কেবলমাত্র বড় বড় নৌকা নির্মাণকারী সুত্রধরেরা বাস করত।"[৮৪] ইতালীয় পর্যটক বার্থেমার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বাংলার লোকেরা বিভিন্ন প্রকারের প্রকান্ড জাহাজ ব্যবহার করে; এসব জাহাজের মধ্যে কতগুলো চেপ্টা তলবিশিষ্ট করে নির্মাণ করা হয়; কেননা এরূপ জাহাজ খুব অগভীর পানিতে চলাচল করতে পারে সামনে ও পেছনে প্রসারিত অগ্রভাগ (গলুই) বিশিষ্ট এক ধরণের নৌকা বাংলায় প্রস্তুত করা হয়। এগুলো দুটো হাল ও দুটো মাস্তুল আছে এবং এগুলো অনাবৃত থাকে । এক ধরনের বড় জাহাজও ছিল, যা 'গিউঙ্কী' নামে পরিচিত। এ গিউঙ্কীর প্রত্যেকটি এক হাজার বড় পিপার (টন হিসেবে) মাল বহন করে; এর উপর তারা কয়েকটি ছোট নৌকা মেলাচা নামক শহরে নিয়ে যায়। দৈর্ঘ্য হিসাবে এসব নৌকার নাম রাখা হত 'বাইশ' 'পঁচিশ' ইত্যাদি। গলুইতে বিভিন্ন জন্তুর মুখ খোদাই করে সেই অনুসারে নৌকার নাম হত 'সিংহমুখী' 'বাঘমুখী' 'শঙ্খচুড়' ইত্যাদি। যুদ্ধে যে সকল

Dhaka University Institutional Repository

নৌকা ব্যবহৃত হত তাদের মধ্যে ছিল রনজয়, নরভীমা, দূর্গাবর ইত্যাদি। সাধারণত সুসজ্জিত বিলাস তরণীর নাম ছিল চন্দ্রপান, হীরামূখী, নাটশালা প্রভৃতি। সওদাগরী নৌকার নাম ছিল 'মধুকরা' সমুদ্রগামী বড় নৌকাকে বলত 'বুহিত'। [৮৫]

চর্তুদশ শতকের আরব ঐতিহাসিক ফয়জুল্লাহ আল উমর উল্লেখ করেন যে, বাংলার অনেক জাহাজের ভেতরে কারখানা তন্দুর ও বাজারের ব্যবস্থা ছিল। তিনি বলেন যে, এসব জাহাজ এত বৃহৎ ছিল যে, একই জাহাজের যাত্রীরা বেশ কিছুকাল পরে একে অন্যকে জানতে পারত। এছাড়া নৌকার গতিশীলতা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, যদি একটি তীর দু'শত চলন্ত নৌকার মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী নৌকাটি লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হত তাহলে তাদের দ্রুতগতির দরুণ তীরটি ঐ নৌকায় না পড়ে এদের মাঝের নৌকাগুলোর একটির উপর গিয়ে পড়ত।[৮৬]

মূলত জলপথে বাণিজ্য বিস্তারের ফলে জাহাজ তৈরির ও জাহাজ পরিচালনা ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল। সিংহল, ভারতের পশ্চিম উপকূল, গুজরাট ও মালদ্বীপের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাংলা থেকে সুতিবস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য বহনের জন্য উল্লেখিত জাহাজগুলো ব্যবহৃত হতো। দেবদারু জাতীয় গাছের তৈরি জাংকে একটিমাত্র ডেকে ৫০ থেকে ৬০ টি কেবিন থাকত। জাহাজের দৈর্ঘ্য ২৫০ ফুট ও প্রস্থ ১১০ ফুট হতো। এর ভেতর ও বাইরে জলনিরোধের ব্যবস্থা থাকত। ডেকের নীচে আবাসিক প্রয়োজনে কতগুলো কক্ষ নির্মিত হতো। এসব জাহাজের আকার অনুযায়ী নাবিকের সংখ্যা ১৫০ থেকে ৩০০ মধ্যে সীমিত থাকত।[৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

৪. ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনীতি

দ্বাদশ শতাব্দীতে তৎকালীন বাংলায় বিভিন্ন কারণে বাণিজ্যিক কার্যক্রম প্রায়ই থমকে দাঁড়িয়েছিল। মানসম্পন্ন একক মুদ্রা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, নগর কেন্দ্র সংখ্যায় কমে যাওয়া, সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও অসমৃদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কারনে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল। এটা বলা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইবনে বখতিয়ার খলজির অশ্বারোহী/সেনাদল (ঘোড়া ব্যবসায়ী দল) তাঙ্গান (tangan) ঘোড়া আনায়ন করেছিল ফলে পরবর্তীতে উত্তর ভারত থেকে ঘোড়া আমদানী শুরু হয়। *তবকাত-ই-নাসিরির* লেখক মিনহাজ-ই-সিরাজ ৪০ বছর পর (১২০৪-১২৪৪) যখন তিনি লখনৌতিতে আসেন তখন তিনি উক্ত বিষয়টি জানতে পারেন।[৮৮] ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে নতুন অভিজাতশ্রেণীর শাসকদের আগমণের ফলে অর্থনৈতিক গতিশীলতা, নগরায়নের প্রক্রিয়া এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন নিশ্চিতভাবে বাণিজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং উন্নতি সাধন করে।

উপরিউক্ত কারণসমূহ ছাড়াও ব্যবসায়-বাণিজ্য পূনরুজ্জীবিত ও বহি:বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য আরও কতিপয় উপাদান ছিল। যেমন, নতুন অভিজাত শাসকবৃন্দের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, কেন্দ্রিয় শাসনব্যবস্থা এবং কতিপয় নির্দিষ্ট দ্রব্যাদির চাহিদা।[৮৯]

এটা নিশ্চিত যে, সমাজে বহিরাগতদের আগমণ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি সাধন করে। বিদেশীদের চাহিদা পূরণের জন্য জনসাধারণ বাজারে নির্দিষ্ট দ্রব্যাদির দোকানপাঠ গড়ে তোলে যা ব্যবসায়-বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত করে। বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন যে, ব্যবসায়ীরা তুর্কীদের কাছে কর্পুর, জাফরান/কুমকুম, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, সিল্ক, জুতা

Dhaka University Institutional Repository

(paijjala or pai-i-jan) এবং মোজা প্রভৃতি বিক্রি করতো যা নিঃসন্দেহে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল।[৯০] মুসলিম শাসকগণ বিদেশী বণিকদের সব রকম সুবিধা প্রদান করতেন এবং ক্ষতিগ্রস্থদের আর্থিক অনুদান দিতেন। এতে করে ভিনদেশী ব্যবসায়ীরাও বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে ইরানি, ইতালিয়, তুর্কি ও আরব বণিকগণ এবং পশ্চিম ভারতের চৌল ও গোয়া থেকে আগত বণিকশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া পনের শতকের দিকে বাংলার শাসকগণ মালাক্কার সুলতানের নিকট পত্র ও উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন। সুলতান কিছু সংখ্যক বণিককেও সেখানে বসবাস করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।[৯১]

বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফিরূজাবাদ, সোনারগাঁও, মুয়াজ্জামাবাদ, সাতগাঁও, শহর-ই-নও, চাটগাঁও, কামরূপ ও ফতেহাবাদ ইত্যাদি নগরকেন্দ্রগুলো ছিল তৎকালীন বাংলার প্রধান স্থান।[৯২] চৈনিক দূতগণের বর্ণনায়ও তৎকালীন বাংলার সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। সিলেট থেকে নৌকা ভ্রমণের সময় ইবনে বতুতা নদীর বাঁকে বাংলার সমৃদ্ধ বন্দর লক্ষ্য করেছিলেন।[৯৩]

কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচুর উদ্ধৃত্ত থাকায় এবং সমুদ্রযাত্রায় মুসলমানদের নতুন উদ্দীপনার ফলে বাংলার বাণিজ্য বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়। চর্তুদশ-পঞ্চদশ শতকের চৈনিক দূতগণের বর্ণনায় জানা যায় যে, চীনের সাথে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।[৯৪] ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো (১২৭১-১২৯৪) দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণের সময়ে বাংলার সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দেখতে পেয়েছিলেন।[৯৫] তাছাড়া, বাংলা সাহিত্য থেকেও দক্ষিণ উপকূল

Dhaka University Institutional Repository

সীলোন ও গুজরাটের সাথে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৯৬] ষোড়শ শতকে বাংলায় আগত বিদেশী বণিকদের বর্ণনা থেকে ভারত সীলোন, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, বার্মা, করোমন্ডল উপকুল, আরব, পারস্য ও আবিসিনিয়ার সাথে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপস্থিতির সাক্ষ্য দিয়েছেন।[৯৭]

তৎকালীন সুলতানী বাংলা যেসব পণ্য রপ্তানি করত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সুতি কাপড়, চাল, চিনি, আদা, মরিচ, তেল, মাখন, শুটকি, ডাল, ফল, পান, সুপারী, পেয়াজ, রসুন, ঘৃতকুমারী, ছাগল, ভেড়া, কবুতর, পাটের সামগ্রী, হলুদ, লবণ, হরতকী, আয়না ইত্যাদি।[৯৮] অন্যদিকে আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে সোনা, রুপা, রেশম, লোহা, কস্তুরী, দামী পাথর, হাতির দাত, শঙ্খ, চন্দন, চীনামাটির তৈজসপত্র উল্লেখযোগ্য।[৯৯] বাংলায় সাধারণত বিলাসবহুল পণ্য আমদানি করা হতো। সমকালীন বাংলা সাহিত্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুসলমান আমলে বাংলার সমৃদ্ধ জাহাজ নির্মাণ শিল্প থেকে ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যকলাপের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদেশী পর্যটক ও বণিকগণ আরব, ইরানি, আবিসিনীয় এবং ভারতীয় বড় বড় ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে এবং বাংলার বিভিন্ন বন্দর ও নগরে তাদের বৃহৎ বাণিজ্য সম্মন্ধে উল্লেখ করেছেন। বাঙ্গালা শহরের মুসলমানদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বার্বোসা লিখেছেন, তারা সকলেই বড় বড় বণিক এবং 'মোকাহ' বন্দরের বণিকদের মতো একই ধরনের বাংলার বাণিজ্য তরীগুলো নির্মিত।[১০০] মাহুয়ান মুসলমানদের সম্পর্কে বলেন যে, তাদের মধ্যে ধনী লোকেরা বৃহৎ জাহাজ তৈরী করতো এবং এতে করে তারা বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়- বাণিজ্য চালাত। ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যকলাপের ফলে বাংলায় বহু সমুদ্র-বন্দর ও নদী বন্দরের উন্নতি হয়। মুসলিম শাসনের শুরু থেকে

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম ছিল একটি প্রসিদ্ধ বন্দর এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র। একজন চীনা দূত লিখেছেন "সা-টি-কিং (চাটিগাঁও বা চট্টগ্রাম) সাগরের মুখে অবস্থিত। বিদেশী বণিকগণ এখানে আগমন করে এবং জাহাজ নোঙ্গর করে। তারা এখানে সমবেত হয় এবং তাদের পণ্যদ্রব্যের মুনাফা বন্টন করে।"[১০১] পর্তুগীজরা এ বন্দরটিকে পোর্টো গ্রান্ডি (ডি বন্দর) বলে অভিহিত করে এবং তাদের বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায় যে, এটা মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যের কর্মচঞ্চল কেন্দ্র ছিল এবং এর প্রতি পর্তুগীজ বণিকদের লোভ ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে নগরায়নের ফলেই সুলতানী আমলে ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে।

সুলতানী আমলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সম্ভবত বিদেশী বণিকদের কাছে তৈরি পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করতেন। বার্বোসা বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলগুলো বিশাল সংখ্যক মুসলমান অধিবাসী দ্বারা পূর্ণ দেখেছিলেন; যারা ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। 'বাঙ্গালা'র সম্পদ ও আবহাওয়ায় আকৃষ্ট হয়ে বহু আরবদেশীয়, পারস্যবাসী, আবিসিনীয় এবং ভারতীয় বণিক সেখানে এসে হাজির হয়েছিলেন। "মক্কার কায়দার" তাদের বড় বড় জাহাজ ছিল যার দ্বারা তারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতেন । তারা এদেশের বহু পণ্যদ্রব্য করমন্ডল, মালাক্কা, পেগু, ক্যাম্বে এবং সীলনে নিয়ে যেত। [১০২] বিদেশে এগুলো অবিশ্বাস্য রকম উচ্চমূল্যে বিক্রি হত। ভাসকো-দা-গামা বলেছেন যে "স্থানীয় ভাবে যে কাপড় ২২ শিলিং ৬ পেন্সে বিক্রি হয় কালিকটে তার মূল্য ৯০ শিলিং।"[১০৩] এছাড়া বার্বোসা বলেন যে ".....এক কুইন্টাল চিনির দাম মালাবারে এক হাজার তিন শত রি, সর্বোৎকৃষ্ট একটি চৌতরের দাম ছয়শত রি, একটি সিনবফের দাম দুই ক্রুসেডো এবং সর্বোৎকৃষ্ট এক খন্ড বিটিলহর দাম তিনশত রি, ফলে যারা এগুলো ঐ স্থানে নিয়ে যেত তারা

সেগুলো বিক্রি করে প্রচুর লাভ করতো। রপ্তানিকৃত পণ্যগুলোর মূল্য আধুনিক মুদ্রায় পরিবর্তন করে বর্তমান ওজনের মান অনুযায়ী সেগুলোর বর্তমান মূল নির্ধারণ করা যেতে পারে । নিচের সারণিতে সেটা দেখানো হলো:[১০৪]

পণ্যদ্রব্য	পর্তুগিজ ওজন বা মাসা	বর্তমান ওজন	পর্তুগিজ মূল্য	বর্তমান মূল্য
চিনি	১ কুইন্টাল	১২৮পাউন্ড	১৩০০ রি	প্রায় ১পা: ৮শি:
চৌতর	২০পর্তুগিজ গজ× ৩ বা ৪ পর্তুগিজ গজ	-	৬০০রি	প্রায় ১৩শি:
সিনবফ	”	-	২ক্রুসেডো বা ৮৪০	প্রায় ১৮ শি:
বিটিলহর	”	-	৩০০ রি	প্রায় ৬$\frac{১}{২}$

মূলত, এই চিত্র ছিল মালাবারে বিক্রিত বাংলার পণ্যের মূল্যের, যার মূল্য বাংলায় অনেক কম ছিল । বাংলায় পণ্যদ্রব্যের সঠিক মূল্য জানা না গেলেও ভাস্‌কো-দা-গামার উক্তি থেকে দেখা যায় যে, যে কাপড় বাংলায় ২২ শিলিং এ বিক্রি হত কালিকটে তার মূল্য ছিল ৯০ শিলিং। ফলে কালিকট ও বাংলায় এর মূল্যের অনুপাত ছিল প্রায় ৪:১ ।[১০৫]

সেকালে সপ্তগ্রাম ছিল বেচাকেনা ও আমদানি-রপ্তানির কেন্দ্রস্থল। তাছাড়া তান্ডা, গৌড় এবং বাকলা বা বরিশাল জেলা মুসলমান শাসনামলে প্রসিদ্ধ

ব্যাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।[১০৬] বাংলার নদীগুলো নাব্য হওয়ায় বড় বড় বাণিজ্য জাহাজ চলাচলে মুসলিম শাসনামলে বহু অভ্যন্তরীণ শহর গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক নগরে উন্নীত হয়। ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সোনারগাঁও একটি প্রধান বন্দর ছিল। চীন এবং জাভার বণিকরা ব্যবসা উপলক্ষে এই বন্দরে আগমন করত। ভেনিস, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, মক্কা, এডেন, প্রভৃতি দেশ থেকে বাংলায় বাণিজ্য দ্রব্য আসত।[১০৭] একজন চৈনিক দূত বলেন, "সোনা-উর-কোঙ্গ (সোনারগাঁও) একটি বড় বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে সমস্ত পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও বন্টন করা হয়।" ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সোনারগাঁও একটি সমৃদ্ধশালী বন্দর ছিল। মূলত, বাংলার এসব বন্দরসমূহ আমদানি-রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং বিপুল পরিমাণ রপ্তানির জন্য বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য খুবই অনুকূলে ছিল। সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং আরাম ও বিলাসের প্রতিটি জিনিসপত্র এদেশে উৎপন্ন হত। ফলে যেসব দেশের সঙ্গে এদেশ ব্যবসায়-বাণিজ্য করত তাদের থেকে বাংলার তেমন কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করতে হত না। বিদেশীরা বাংলার পণ্যশস্যের মূল্য স্বর্ণ, মুক্তা ও মূল্যবান পদার্থের মাধ্যমে পরিশোধ করত এবং এভাবে দেশে প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য আসত। একমাত্র উল্লেখযোগ্য পণ্য যা বাংলাদেশ আমদানি করত তা ছিল চীনামাটির বাসন ও আফ্রিকার ক্রীতদাস। চীন থেকে আমদানি হতো স্বর্ণ, রৌপ্য, সার্টিন, সিঁদুরও কাগজ প্রভৃতি। অপরপক্ষে বাংলা থেকে চীনে রপ্তানি হতো মসলিন, চাল, চিনি, মুক্তা, মূল্যবান পাথর ঘোড়া, রঙিন পাত্রও গোলমরিচ প্রভৃতি দ্রব্য। এছাড়া অন্যান্য যে সব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হতো তা হলো বিভিন্ন রকমের প্রচুর খাদ্য, সংরক্ষিত হরিতকী, আদা, কমলালেবু, বরই, ডুমুর, কুমড়ো, ভারতীয় লাউ ও অন্যান্য ফল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি করা হত। রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে আরো ছিল কালো মাটির কড়া গন্ধযুক্ত বাসন।

মালাক্কা অঞ্চলে ঐ সস্তা দামের বাসনের খুব কদর ছিল। তার পরিবর্তে মালাক্কা থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানি হতো।[১০৮]

বাংলা থেকে মালাক্কার রপ্তানি পণ্যের ও বাণিজ্যলব্ধ মুনাফার উল্লেখ করে তোমো পিরেস বলেন যে, "বছরে একটি জাংকে করে ৮০ থেকে ৯০ হাজার ক্রুসেডো মূল্যের পণ্য মালাক্কায় যেত। কখনো কখনো দ্বিতীয় বার ও পণ্যবাহী জাংক মালাক্কায় যেত। বাংলার সাথে মালাক্কার ব্যবসা ছিল লাভজনক। বাংলায় ৩৬%-এর বেশী এবং মালাক্কায় ৬% আমদানি কর দিয়েও প্রতিটি পণ্যের জন্য লাভ হত আড়াই থেকে তিনশ ভাগ (২৫০%–৩০০%) বেশী। মালাক্কায় বাংলা থেকে রপ্তানিকৃত রৌপ্যের দাম ছিল এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ বেশী।"[১০৯] বাংলার বণিকগণ তাই অধিক মুনাফা লাভের জন্য মালাক্কার সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত। সুলতানী আমলের ব্যাপক নগরায়নের ফলেই বণিকগণ স্বর্ণও রৌপ্যের ব্যবসায় আগ্রহ প্রদর্শন করেছিল। এরূপ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সফলতার ফলে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি সুলতানী আমলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়ায়।

সুলতানী আমলে মুসলিম শাসকদের আরেকটি বড় অবদান হল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা ও দ্রব্যমূল্য সহনশীল পর্যায়ে রাখা। সমসাময়িক বিবরণে বাংলা একটি প্রাচুর্য্যপূর্ণ ও সুলভ দেশরূপে চিহ্নিত হয়েছে। ইবনে বতুতা মন্তব্য করেন যে, পৃথিবীর কোথাও তিনি এমন একটি দেশ দেখেননি যেখানে জিনিসপত্র বাংলার মত এত সস্তায় বিক্রি হয়। তাঁর এবক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় অন্যান্য বিদেশী পরিব্রাজক এবং সমকালীন ঘটনাপঞ্জি ও বিদেশী লেখকদের বিবরণ থেকে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সুলভতার একটি ধারণা ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় । তাঁর বর্ণিত

দিল্লী রতল মণ (৪০ সের বা ২৮.৮ পাউন্ড) হিসেবে ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে এটি বাংলার ওজন মানের প্রায় চৌদ্দ সের। ঐতিহাসিকগণের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ইবনে বতুতার ভ্রমনের সময়ে একটি মূল্য তালিকা উল্লেখ করা হলো:

চাল প্রতি মন = ১ আনা ৯ পয়সা

চিনি প্রতি মন = ১ টাকা ৭ আনা

১ মন ঘি = ১ টাকা ৭ আনা

১টি দুগ্ধবতী গাভী = ৩টাকা

১টি তাজা মুরগী = ৩ পয়সা

২টি কবুতর = ৩ পয়সা

১টি ভেড়া = ৪ আনা

মিহি সুতি কাপড় ১৫ গজ = ২ টাকা

১জন সুন্দরী তরুনী দাসী = ১০ টাকা ।[১১০]

তৎকালীন সময়ে জিনিসের প্রাচুর্য্য ও সুলভতার জন্য সাধারণ শ্রেণীর শ্রমিকরাও ভাল খেতে ও স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারতো। ইউরোপীয় বর্ণনা থেকে এ সত্য প্রমাণিত হয়। বার্ণিয়ার (১৬৫৬-১৬৬৪) বলেন যে, ভাত বা ঘিয়ের সঙ্গে তিন চার রকমের তরি-তরকারি সাধারণ লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল। এসব অতি সামান্য দামে কেনা যেত। রাজহাঁস ও পাতিহাস খুব সস্তা ছিল। প্রত্যেক প্রকারের মৎস (তাজা বা লবণযুক্ত) পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত।[১১১] এছাড়া চাকরানী, দুর্বলা দাসীর নানাপ্রকার মাছ, তরিতরকারি, খাসির মাংস ইত্যাদি বাজার করার কথা উল্লেখ করেছেন। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' একজন তাঁতীর বেশী পরিমাণে বাজার করার কথা উল্লেখ করেছেন।[১১২] বাংলার জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত

ছিল যে, "বাংলা রাজ্যে প্রবেশের শত দরজা খোলা আছে; কিন্তু ফেরার একটি দরজাও নেই।"[১১৩]

সুলতানী আমলের নগরায়নের ফলে বাংলার সকল স্তরের জনগণের উপর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগে । কারণ তৎকালীন সময়ে স্বল্প আয়ে একটি পরিবার স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতে পারত। মাত্র $১\frac{১}{৪}$ রূপী হলে একজন লোক তার স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে পুরো মাস ভালভাবে কাটাতে পারত। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সকল তথ্য থেকে জানা যায় যে, এ সময়ে কোন লোকই এর কম উপার্জন করত না। আবুল-ফজল প্রণীত কতিপয় শ্রেণী পেশার লোকের অর্জিত আয়ের তালিকা নিরূপণ:[১১৪]

১ জন	কাঠ মিস্ত্রী	মাসিক	৪ রূপী
১ জন	পানি বহনকারী	"	২ রূপী
১ জন	ইটভাটার শ্রমিক	"	$২\frac{১}{২}$ রূপী
১ জন	বাঁশ কর্তনকারী	"	$১\frac{১}{২}$ রূপী

একেবারে ভূমিহীন ও কর্মহীন লোক এ সময়ে বাংলায় অনুপস্থিত ছিল। পুরো চার শতাব্দীকাল কোন দেশের একটানা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিশ্বের ইতিহাসে একটি বিরল দৃষ্টান্ত যা কিনা বাংলায় উপস্থিত ছিল। [১১৫]

সুলতানী আমলে বাংলায় দাদনী প্রথার প্রচলন ঘটেছিল। ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার উল্লেখ করেন যে, "যে মনীষা প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটায় অথবা যান্ত্রিক উদ্ভাবনের ক্রমবিকাশ সম্ভব করে তোলে সেই ক্রিয়াশীল বুদ্ধিবৃত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা রীতির সৃষ্টি করে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো কতগুলো প্রযুক্তির সমতুল্য। দাদনী প্রথা এ জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অন্যতম।"[১১৬] বণিকগণ পণ্যক্রয়ের উদ্দেশ্যে দালালকে অগ্রিম টাকা দিত। দালাল সে টাকা পাইকারকে দিলে বিভিন্ন স্থানের বা শহরের উৎপাদক কারিগরদের মধ্যে পাইকার সে অর্থ বন্টন করত। সেই অর্থের জন্য কারিগর পাইকারের জামিনদার এবং পাইকার দালালের জামিনদার হিসেবে গণ্য হত। এ ঐতিহাসিক প্রথা দাদনী প্রথা নামে পরিচিত। দাদনী প্রথায় কারিগর পণ্যের মূল্যের অধিকাংশ হাতে পেত এবং নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকত। গৃহীত অর্থ কারিগর কাঁচামাল ক্রয়ের কাজে ও পরিবারের ভরন পোষণের জন্য ব্যয় করতে পারত। বাংলা ও ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে দেশী ও বিদেশী বণিকগণ দাদনী ব্যবস্থার মাধ্যমে কারিগরদের কাছ থেকে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বণিকগণ নগদ অর্থ দিয়েও পণ্য কিনত।[১১৭] এ প্রথা বাংলার অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধির পরিচয় বহন করে।

তৎকালীন সময়ের বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন। সে কালের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় হুন্ডি ছিল Letter of Credit বা Bill of Exchang ধরনের মাধ্যম। কোন মহাজন কারবারির কাছে টাকা জমা দিয়ে একটি অঙ্গীকার নিয়ে ব্যবসায়ী বা পর্যটক অন্য একজন সরবরাহের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের পর কিছু অর্থ বাট্টা হিসেবে বাদ দিয়ে উক্ত পত্রের শর্ত অনুযায়ী টাকা ফেরত দিতে পারত। সুদ, বীমা খরচ ও টাকা বহনের জন্য খরচ সাধারণত বাট্টার অন্তর্ভুক্ত হত। মুসলিম আমলে ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবার ফলে হুন্ডি ব্যবসা প্রসার লাভ করেছিল। হুন্ডি Credit বা ব্যাংকে জমানো টাকার কাজ করত এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নগদ অর্থ পরিবহনের ঝুকি থেকে মালিককে রক্ষা করত। এই হুন্ডি ব্যবসায়ের ফলে

দূরবর্তী স্থানের বণিকদের কাছে সহজেই টাকা পাঠানো যেত।[১১৮] মূলত এ ব্যবস্থা সুলতানী আমলে আন্তর্জাতিকভাবে চালু হয়েছিল। এ হুন্ডি ব্যবসা থেকেও তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

সুলতানী আমলে বাংলায় কোন প্রকার দুর্ভিক্ষ না হওয়া বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি বড় প্রমাণ। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও সরকারী কোষাগার থেকে তৎক্ষণাৎ সাহায্য পৌঁছে যেত। এক্ষেত্রে নদ-নদী ও খাল-বিল সহায়ক ভূমিকা পালন করত।[১১৯] যদিও উত্তর ভারতে কিছু কিছু দুর্ভিক্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় তথাপি সমগ্র বাংলায় এরকম দুর্ভিক্ষের নজির ইতিহাসে খুজে পাওয়া যায় না।[১২০] সুলতানী আমলে বাংলায় ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ফলেই মূলত বিভিন্ন শহর, বন্দর ও নগর গড়ে ওঠে। নগরের উদ্ভব তৎকালীন সময়ে উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার নির্দেশ দেয়। সুলতানী আমলের নগরায়ন বাংলাকে অর্থনৈতিক (কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে) দিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী করেছিল। তৎকালীন সময়ে জীবন-ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কম থাকায় জনসাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করতে পারত। প্রাচুর্য্য ও দ্রব্যমূল্য সস্তার দরুণ সাধারণ লোকের জীবনযাত্রাও সহজ ছিল।

তথ্য নির্দেশ

১. Momtazur Rahman Tarafdar, *Husain Shahi Bengal*, 1494-1538 A.D: A Socio-Political Study, Dhaka, 1999, pp. 9-10

২. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৯৯

৩. Momtazur Rahman Tarafdar, *op.cit*, p. 29

৪. Muhammad Mohar Ali, *History of The Muslims of Bengal*, vol. 1B, Riyadh, 1985, p. 926

৫. নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৫-২৮৭

৬. ঐ , পৃ. ৩৮২

৭. বিজয় গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫; বিপ্রদাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০; মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭

৮. মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩

৯. A B M Samsuddin Ahmed, *Bengal Under the rule of the Early Iliyas-Shahi Dynasty*, Ph.D Thesis, DU, 2001, p. 227

১০. Ibid

১১. Ibn Battuta,*The Rehla of Ibn Battuta*, *op.cit*, pp. 234-235; Chinese Accounts *in Visva Bharati Annals*, (eng.tran.) Prabodh Chandra Bagchi, vol.1, Calcutta, 1945, pp. 96-97,117,121,24,130

১২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৬৬; নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২,৩৪৭

১৩. ঐ, পৃ. ৪২

১৪. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯-৩০

১৫. ঐ, পৃ. ২৪

১৬. মো. রেজাউল করিম, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, মুদ্রা ও মুদ্রাব্যবস্থা (মধ্যযুগ), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পাদক-সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ১৫

১৭. Md. Rezaul karim, *A Critical Study of the Coins of the Independent Sultans of Bengal*, Ph.D.Thesis, University of Dhaka, 2001, p.19

১৮. Ibid

১৯. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, সুলতানী আমল, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ১৫৯-১৬০,

২০. ঐ, পৃ. ১৫৫

২১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২৩

২২. Md. Rezaul karim, *op.cit*, p. 92

২৩. আবুল ফজল আলামী, *আইন -ই-আকবরী*, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, অনুবাদ, আহমেদ ফজলুর রহমান, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩৪

২৪. Muhammad Mohar Ali, *op.cit*, p.927

২৫. নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫-৯৮

২৬. তবকাত- ই- নাসিরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৫-৬২

২৭. Irfan Habib, "Economic History of the Delhi Sultanate", *The Indian Historical Review*, vol.5, No-1, July, 1977, p. 298

২৮. C.R. Boxer, *The Fortugucse Sea-borne Empire*, 1415-1825, London , 1969, p. 41

২৯. Tapan Ray Chaudhury and Irfan Habib (ed.) *The Cambridge Economic History of India*, 1200-1750, vol.1, Cambridge, 1982, p. 50

৩০. Abul Fazl, *Ain-i-Akbari,* vol.I, (eng.tr.) H.S.Jarret, Culcatta, 1949, p.134

৩১. *Visva Bharati Annals, op.cit,* p. 99

৩২. মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.৩১

৩৩. ঐ

৩৪. *Visva Bharati Annals, op.cit, p.* 119

৩৫. Ibn Battuta, *op.cit*, p. 234

৩৬. *Visva Bharati Annals, op.cit pp.* 96-134

৩৭. K.M.Ashraf, *op.cit* , p. 96

৩৮. Muhammad Mohar Ali, *op.cit* , p. 935

৩৯. কে.এম.আশরাফ, *হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচর্চা*, কলকাতা, ১৯৯৪,পৃ. ১৬১

৪০. Md. Akhtaruzzaman, *Society And Urbanization In Medieval Bengal,* ASB, 2009, p. 325

৪১. Ibid

৪২. Ibid

৪৩. Ibid

৪৪. Ibid

৪৫. Ibid

৪৬. Ibn Battuta, *Travels of Ibn Battuta,* tr. H.A.R. Gibb, 3rd edi, New Delhi, 1993, p. 618

৪৭. *Visva Bharati Annals,* p.96-97; নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রাও কালক্রম*, অনুবাদ, মোঃ রেজাউল করিম, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১২২

৪৮. Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires*,vol.1, London, 1944, p. 192

৪৯. মমতাজুর রহমান তরফদার, "তোমো পিরেসের বিবরণে বাংলা দেশ", *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ১৯৯১, পৃ. ১৯৮-১৯৯

৫০. Ziauddin Barani, *Tarikh-I-Firuz Shahi(ed.)* Saiyid Ahmad Khan, Culcutta, 1962, p. 120

৫১. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খন্ড (১২০৩-১৫৭৬), মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৪৬

৫২. কে.এম.আশরাফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪১-১৪৩

৫৩. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৭

৫৪. কে.এম.আশরাফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২

৫৫. ঐ

৫৬. ঐ , পৃ. ১৬১

৫৭. Muhammad Mohar Ali, *op.cit* , p. 937

৫৮. Ibid, p. 938

৫৯. Ibid

৬০. চন্ডীদাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭, ১৩, ১৮-১৯, ২৬-৬৩, ৭১,৭৩; শাহ মুহাম্মদ সগীর, পৃ. ৮-১০, ২৩, ৩৩, ৩৭, ৭৫, ৮৫, ১০০, ১২৯,১৫৯-১৬২,২৩২

৬১. *Visva Bharati Annals, op.cit,* p.119,125

৬২. Ibid , p.124

৬৩. Md. Akhtaruzzaman, *Society And Urbanization In Medieval Bengal,* ASB, 2009, pp. 333-334

৬৪. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

৬৫. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

৬৬. ঐ

৬৭. Md. Akhtaruzzaman, *op.cit*, pp. 335-336

৬৮. Ibid, pp. 338-343

৬৯. Ibid

৭০. Ibid

৭১. Ibid

৭২. A.H.Dani, *op.cit*, pp. 18,19,63,67

৭৩. *Visva Bharati Annals, op.cit,* yp.121

৭৪. A B M Samsuddin Ahmed, *Bengal Under the rule of the early Iliyas-Shahi Dynasty,* Ph.D Thesis, DU, 2001, p. 258

৭৫. মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.২২

৭৬. কে.এম.আশরাফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

৭৭. J.N.Dasgupta, *Bengal in the sixteenth century*, p. 117

৭৮. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* vol.1 (1201-1576), Karachi, 1963, pp. 392-393

৭৯. ঐ

৮০. Mahuan, *op.cit,* p. 161

৮১. Abul Fadl, *op.cit,* p. 74

৮২. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩

৮৩. R.K Mukherjee, *A History of Indian Shipping*, Orient Longmans, 1957, p. 158

৮৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬

৮৫. ঐ

৮৬. শ্রী নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস,* কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪১

৮৭. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫-২৬

৮৮. Md. Akhtaruzzaman, *op.cit*, pp. 343-345

৮৯. Ibid

৯০. Ibid

৯১. Tome Pires, *op.cit*, p. 143

৯২. Ibn Battuta, *op.cit*, pp. 234-235; *Visva Bharati Annals*, op.cit , pp. 121-123,

৯৩. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

৯৪. *Visva Bharati Annals,* op.cit pp. 99-133

৯৫. নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৩

৯৬. বিজয় গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫-২৫৩; বিপ্রদাস, *প্রাগুক্ত*,, পৃ.১৪০, ১৪২, ১৫০, ১৫৫, ১৬৪-১৬৬

৯৭. A B M Samsuddin Ahmed, Ph.D Thesis, DU, 2001, p.267

৯৮. Ibid

৯৯. *Visva Bharati Annals,* op.cit, p.123; বিজয় গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*,, পৃ. ২৬৭-২৭৪; বিপ্রদাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৯

১০০. Muhammad Abdur Rahim, *op.cit*, p.396

১০১. *Visva Bharati Annals,* op.cit, pp. 96-134,

১০২. বার্বোসা, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৫-১৪৭

১০৩. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৩

১০৪. ঐ

১০৫. ঐ

১০৬. শ্রী নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

১০৭. Tome Pires, *op.cit* , p.13

১০৮. H.Roy, *Trade and Diplomacy in India, China Relation, A* Study of Bengal During the Fifteenth Century, New Delhi, 1993, p. 114

১০৯. Tome Pires, *op.cit,* pp. 92-93

১১০. Ibn Battuta, *op.cit,* pp. 201-220 ; নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১০৪-১০৫

১১১. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতি ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, ১৯৮২, পৃ. ৩৫৫; দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, পৃ.২৩৩

১১২. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

১১৩. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২২

১১৪. Muhammad Mohar Ali, *op.cit,* pp. 964-966

১১৫. Muhammad Abdur Rahim, *op.cit*, pp. 403-404

১১৬. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৯

১১৭. ঐ

১১৮. Muhammad Abdur Rahim, *op.cit*, pp. 403-404, মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

১১৯. Muhammad Mohar Ali, *op.cit,* p. 960

১২০. Ibid, p. 949

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে নগরায়নের প্রভাব

সুলতানী আমলের পূর্বে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় গতিশীলতা ছিল অনেকটা সীমিত পর্যায়ের। তবে এ সীমিত পর্যায়ের গতিশীলতার কারণ সামাজিক বা আচারগত দিক থেকে কোন কোন শ্রেণীর যেমন পতন ঘটেছিল; তেমনি আবার কোন কোন শ্রেণী আর্থ-সামাজিক কারণেই অধিকতর সামাজিক মর্যাদা পেয়ে জাতিগতভাবে উন্নীত হয়েছিল। প্রাক-মুসলিম যুগে এবং তুর্কি আক্রমনের অল্পকাল পরে নিম্নশ্রেণীর লোকজনের মধ্যে গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। মমতাজুর রহমান তরফদার দেখিয়েছেন যে, "তৎকালীন সময়ে যে-লোকগোষ্ঠীগুলোকে অন্ত্যজরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তারা হচ্ছে রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত ও মেদ।"[১] এছাড়াও এ সময়ে চুড়ান্ত রক্ষণশীলতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা নিয়ে ব্রাহ্মণগণই শিক্ষা দীক্ষায়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে হিন্দু সমাজের শীর্ষে ছিল। প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যে সকল ব্রাহ্মণ সরাসরি সম্পর্কিত ছিলেন, নগদ বেতনের পরিবর্তে বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে সংগৃহীত রাজস্ব তাঁরা ভোগ করতেন। এছাড়া রাজাকে উপরে রেখে এবং ভূমিদাস, কৃষক ও শ্রমিক কারিগরকে সবচেয়ে নীচের স্তরে স্থাপন করে মধ্যস্বত্বভোগীর যে সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ ছিলেন তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এক্ষেত্রে সামাজিক গতিশীলতা ঘটেছে কখনো ব্যক্তিক পর্যায়ে, কখনো আবার তার প্রভাব বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। তাই এ সময়ে ব্রাহ্মণগণই বিভিন্ন জাতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করত।[২]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক-মুসলিম যুগে প্রশাসন ব্যবস্থায় জমিজমা হস্তান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত ভূমির মাপগ্রহণ, হিসেবপত্র সংরক্ষণ, দলিল দস্তাবেজ তৈরির কাজ, দফতর রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজের জন্য কায়স্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। বৈদ্যগণের ক্ষেত্রে দেখা যায় পেশাগত কারণেই তাদেরকে লেখাপড়া করতে হতো। এজন্যই বৈদ্যশ্রেণীর অবস্থান তার সামাজিক কারনেই কায়স্তদের পাশে। ব্রাহ্মণগণ তাদের বৃত্তিকে শুধু অধ্যাপনা, শাস্ত্র আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি; মন্ত্রিত্ব, সেনাপত্য প্রভৃতি উঁচু প্রশাসনিক পদেও তারা অধিষ্ঠিত ছিল। বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবণতি, নগরের অবক্ষয়, কৃষিভিত্তিক প্রশাসনিক পদ্ধতির ব্যাপকতার দরুন এবং সমাজে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রসম্মত প্রতিপত্তির ফলে উৎপাদক, শিল্পী, কারিগর, বণিক ও অন্যান্য শ্রমজীবি সামাজিক শ্রেণী মর্যাদার দিক দিয়ে নীচের স্তরে নেমে গিয়েছিল।[৩]

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুসলমান শক্তির অভ্যুদয় প্রচলিত সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিয়ে আসে এক পরিবর্তনের ধারা। মুসলমান শাসকগণ সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী এদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। একই ধর্মগোষ্ঠীর অথবা বলা চলে অভিন্ন সংস্কৃতির ধারক শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক পরিবর্তনের ধারা সংযোজিত হয়। এ সময় মুসলিম সুলতানদের সহযোগিতায় একদিকে তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুসঙ্গী হয়ে সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার বিকাশ ঘটে ; অন্যদিকে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অমুসলিমদের প্রতি সহনশীল মনোভাব প্রকাশ করেন। এরই পথ ধরে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গনে আসে রূপান্তর। মুসলিম শাসনামলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি ও প্রশাসনিক পদ্ধতি গড়ে উঠার দরুণ সমাজের সকল স্তরের মানুষ তাদের যোগ্যতানুযায়ী

নির্দিষ্ট স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি হিন্দু ধর্মের নীচের স্তরের হওয়া স্বত্ত্বেও তারা উচ্চপদে চাকুরী করার সুযোগ পেয়েছিল।

১. সামাজিক জীবনে নগরায়নের প্রভাব

বাংলার জনসাধারণের সামাজিক জীবনে নগরায়নের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুলতানগণ সুরম্য অট্টালিকা দ্বারা তাদের রাজধানী সুসজ্জিত করে তোলেন। তারা রাজপ্রাসাদে বসবাস করতেন এবং আড়ম্বরও জাকজমকপূর্ণভাবে জীবন-যাপন করতেন। গৌড় ও পান্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ বাংলার শক্তিশালী শাসকদের আড়ম্বর ও জৌলুসের কথা স্মরণ করে দেয়। সম্রাট হুমায়ুন যখন বাংলার রাজধানী গৌড়ে প্রবেশ করেন তখন তিনি গৌড় নগরীকে অতুলনীয় বিলাসপূর্ণ প্রাসাদরাজিতে সুশোভিত দেখতে পান। তখন রাজধানীর প্রাসাদের মেঝে বহু মূল্যবান কার্পেট দ্বারা সুসজ্জিত এবং স্তম্ভগুলো ছিল চন্দন কাঠ নির্মিত। সম্রাট গৌড়ের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যমন্ডিত আড়ম্বরপূর্ণ ও জাকজমকপূর্ণ জীবন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।[৪] সম্রাট হুমায়ুনের এক শতাব্দী পূর্বে চীনদেশীয় পরিব্রাজক রাজধানী পান্ডুয়ায় গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ও তার উত্তরাধীকারীদের রাজসভা পরিদর্শন করেছিলেন। তারাও সুলতানদের ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের একই ধরনের বর্ণনা দিয়েছেন।[৫] শাসকগণ আমির, ওমরাহ ও অমাত্যবর্গসহ প্রাসাদে বসবাস করতেন।

সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে সুলতানের পরেই ছিল আমির ওমরাহগণ। তারা ছিলেন সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়। হিন্দু শাসনামলের অভিজাত সম্প্রদায় বংশগত মর্যাদার ভিত্তিতে নির্বাচিত হতো। হিন্দু শাসনামলের সাথে মুসলমান শাসনের একটি বিশেষ পার্থক্য হলো অভিজাত সম্প্রদায় বংশগত ছিল না। এখানে বংশগত মর্যাদার চেয়ে প্রতিভাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো। মুসলিম

শাসনামলে বেশির ভাগ অভিজাত ব্যক্তিগণ নিজের যোগ্যতায় আমির ওমরাহ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলো। বখতিয়ার খলজি ও তার সভাসদদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে শাসনকর্তার পদমর্যাদা লাভ করেছিল। তাছাড়া হাবশীগণ কৃতদাসরূপে ইলিয়াসশাহী সুলতানদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন, তাদের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬] মূলত মুসলমান শাসকগণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর গুণী ও যোগ্য ব্যাক্তিদের জন্য সকল ক্ষেত্রে সমান সুবিধা দিয়েছিলেন।

মুসলিম শাসনামলে সুলতানগণ সমাজে ধর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানের যোগ্য স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সুলতানের পরে ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। এরপর উলেমা ও পীর দরবেশদেরকে প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারা সমাজের জনসাধারণের উপর তাদের নৈতিক শক্তির প্রভাব স্থাপন করে। তাদের প্রশাসনিক পদমর্যাদা না থাকলেও শাসকদের নিকট যথেষ্ট সমাদর ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল খান, মালিক ও আমির প্রমূখ ব্যাক্তিবর্গ এবং জমিদার ও অন্যান্যদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৭]

সুলতানী আমলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত ছিল পেশাজীবি তথা চিকিৎসক, কবি, সংগীত শিল্পী, ধর্ম প্রচারকদের দ্বারা । শিল্পী, কারিগরি, স্থপতি ও উৎপাদনকারী ব্যক্তিরা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ যুগে শিল্পকলার সমাদর ছিল বলে কারিগরদের অবস্থান ভাল ছিল। ছোট ছোট কারিগর, উৎপাদক এবং শ্রমিকরা বিভিন্ন শ্রেণী সমাজের সাধারণ অধিবাসী হিসেবে পরিগণিত হতো। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুরা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থান লাভ করেছিল।[৮]

২. হিন্দুদের ধর্মীয় ও পেশাগত ক্ষেত্রে প্রভাব

প্রাক্ সালতানাত যুগে বাংলার অধিকাংশ জনগণ ছিল হিন্দু । তবে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধের অস্তিত্বও পাওয়া যায়, যারা পরবর্তীতে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের দরুণ ও ইসলামের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ ও অন্য কতগুলো নিম্নস্তর থেকে কিছু লোক ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিল এবং এরা বাঙালী সমাজে কারিগরি পেশাজীবি হিসেবে নিজেদের জন্য স্থান করে নিয়েছিল।[৯] তাদের মধ্যে জুলাহা, রংরেজ, সানাকর ও দরজি শ্রেণী ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১০] নতুন ধর্মীয় ব্যবস্থার আওতায় তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি না পেলেও শিক্ষাগ্রহণ ও বিভিন্ন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় অংশগ্রহণের সুযোগ তারা পেয়েছিল।[১১] আলোচ্য সময়ে হিন্দুরা চার বর্ণে বিভক্ত ছিল- ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য ও শুদ্র। এ বর্ণগুলোর মধ্যে কঠোর সামাজিক বাধা-নিষেধ বিদ্যমান ছিল, ফলে এক বর্ণ অন্য বর্ণের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বা লেনদেন স্থাপন করতে পারেনি। ব্রাহ্মণরা তখনও হিন্দুদের সামাজিক জীবনে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিল। যদিও মুসলিম শাসনও তাদের সামাজিক আদর্শ নিচু শ্রেণীর জনসাধারণকে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ও অধীনতা থেকে অনেকটা মুক্তি দিয়েছিল এবং সমাজে জীবন ও মর্যাদার উন্নতি বিধানের জন্য তাদের বহু অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছিল। ব্রাহ্মণরা তাদের একচেটিয়া অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা হারিয়ে ফেলে এবং বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা বুদ্ধিভিত্তিক রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অন্যান্য বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সম্মুখীন হয়।[১২]

এভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একাধিপত্যের সুযোগ-সুবিধা হারিয়ে ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করেছিল। এ সমস্ত পেশা ব্রাহ্মণ সমাজে তাদের মর্যাদা নির্দেশ করে। ব্রাহ্মণগণ তাদের পেশার ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে

এবং তারা গ্রামের বা শহরের বিভিন্ন মহল্লায় বসবাস করত। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তার চন্ডিকাব্যে ব্রাহ্মণ সমাজের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "একটি মহল্লাকে বলা হয় কুলস্থান (অভিজাতদের জায়গা) যেখানে রাঢ় ব্রাহ্মণগণ তাদের মন্দির ও টোল (সংস্কৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) নিয়ে জীবন যাপন করত। অশিক্ষিত ব্রাহ্মণরাও এখানে বসবাস করত। তারা পুরোহিত হিসেবে কাজ করত এবং পূজার আচার-অনুষ্ঠানাদি শিক্ষা দিত। তারা তাদের কপালের অগ্রভাগে চন্দন-ফোঁটা বা তিলক চিহ্ন দিত। পুতুল পূজা করে এবং কাপড়ের আচলে ভিক্ষাপ্রাপ্ত চালের পুটলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত। তারা মিষ্টি বিক্রেতার বাড়িতে এক পয়সা মূল্যের মিষ্টি ও গোয়ালার বাড়ি থেকে পুরা এক পাত্র দুধ পেত, এবং কারো কারো বাড়ি থেকে তাদের মাসিক কড়ি (টাকা-পয়সা) ও অন্যান্যদের থেকে শুকনো মরিচ আদায় করত। তাছাড়া ব্রাহ্মণরা ঘটকালী, চিকিৎসা ও অন্যান্য কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। তারা স্বার্থের লোভে অসাধুতা ও মিথ্যার আশ্রয় নিত। ব্রাহ্মণদের অনেকে ডাকাতে পরিণত হয়ছিল। কায়স্থরা নগর বা গ্রামের একপ্রান্তে বসবাস করত এবং হিন্দু সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করত। মুসলিম শাসনাধীনে তারা তাদের প্রতিভা ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছিল। তারা বিদ্যাবুদ্ধিতে পারদর্শিতা অর্জন করে এবং রাষ্ট্র ও সমাজে মর্যাদাসম্পন্ন পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। তাদের বিদ্যা ও সরকারের প্রতি অনুরাগ এবং মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে কায়স্থরা সরকারী চাকুরীতে এবং জমিদার ও রাজস্ব ইজারাদাররূপে চাকুরীর সুযোগ পেয়েছিল। মূলত, সুলতানী আমলে বৈশ্যরা সাধারণত কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী ছিল। তবে তাদের মধ্যে নানা শ্রেণীর শিল্পকার ও কারিগর ছিল।[১৩] এদের সম্বন্ধে মুকুন্দরাম বলেন, "কেহ জমি চাষ করে, অন্যরা গাভী চরায়। কেহ গরুর গাড়ীর পরিবহনের কাজ করে; কেহ মৌসুমের সময় ফসল ক্রয়

করে সাধারণত যখন বাজার চড়া হতো তখন বিক্রী করত। ..... বৈশ্যরা ছিল গুজরাটে বেশ সুখী শ্রেণী ।"[১৪]

সমাজে শুদ্ররা কৃষক অথবা শ্রমিক ছিল। তারা তাদের পেশার ভিত্তিতে বহু শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। একশ্রেণী জমি চাষ করে ও অন্যরা মাছ ধরে। তাছাড়া তাঁতী, নাপিত, কামার, কুমার, সুত্রধর, কুম্ভকার, ধোপা ও অন্যান্য শ্রেণীর শুদ্রও ছিল। তবে সার্বিকভাবে সুলতানী আমলে হিন্দুরা তাদের প্রতিভা ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছিল এবং শাসকগণ ও তাদের যথোপযুক্ত মূল্যায়ন করত। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বেশ কয়েকজন হিন্দু ব্যক্তির সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠানের মধ্যদিয়ে।

ইলিয়াস শাহের সময় (১৩৪২-১৩৫৭) থেকে রাজশাহী জেলার সান্যাল ও ভাদুড়ী (দুটি ব্রাহ্মণ) পরিবারের উৎপত্তি হয়। ইলিয়াস শাহ বিশেষভাবে চারজন ব্রাহ্মণ ভ্রাতাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। জয়ানন্দ ভাদুড়ী 'দীউয়ান' নিযুক্ত হন এবং সুবুদ্ধি খান, কেশব ও শিখাই সান্যালকে সেনাবাহিনীর উচ্চপদে নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া তাদের কর্তব্যপরায়নতার পুরষ্কারস্বরূপ শিখাই সান্যালকে চলনবিল ও পদ্মানদীর মধ্যকার অঞ্চলের জায়গীর প্রদান করেন এবং সুবুদ্ধি খানকে চলনবিলের উত্তরাঞ্চলের জায়গীর প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এ অঞ্চল চাক্‌লা ভাতুরিয়া নামে অভিহিত হয়।[১৫] অন্যদিকে সনাতন ও রূপ দুই ভাই সুলতান হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। রামচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় একটা ছোট জমিদারী ভোগ করেছিলেন। নবদ্বীপের কোতোয়াল ছিলেন জগাই ও সাধাই। গোপীনাথ বসু ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) মন্ত্রী এবং টাকশাল অধ্যক্ষ অনুপ ছিলেন হিন্দু। রাজমালা অনুসারে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ গৌড়মল্লিককে ত্রিপুরা অভিযানের নেতা

Dhaka University Institutional Repository

নিযুক্ত করেছিলেন।[১৬] এছাড়া শ্রী চৈতন্যের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল।[১৭] হিন্দুদের প্রতি তাঁর (আলাউদ্দিন হোসেনশাহের) এই সহানুভুতির জন্য হিন্দু কবিগণ তাকে নৃপতি-তিলক (তিলকচিহ্ন), জগৎ ভূষণ (বিশ্বের অলঙ্কার) এবং কৃষ্ণাবতার (কৃষ্ণের অক্ষতার) রূপে আখ্যায়িত করেছিল।[১৮]

৩. নগরায়ন ও শিক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষাক্ষেত্রে সুলতানী আমলের নগরায়নের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। সেনামলে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের স্বার্থপরতা সাধারণ মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকারের প্রতি সম্মান দেখায়নি এবং সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গন ছিল বিশৃঙ্খল ও অসংবদ্ধ।[১৯]

আপাতদৃষ্টিতে সুলতানী আমলে শিক্ষাব্যবস্থা দুটি ধাপে বিভক্ত ছিল যথা প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা পাঠ্যসূচীর ধরণের উপর ভিত্তি করে এ ভাগ করা হয়েছিল। মাদ্রাসা (প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা; স্কুল/কলেজ) এবং মক্তব (প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ) ছিল সুলতানী আমলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও সুফি সাধকদের বাড়ী ও খানকাহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হত। মুসলিম শাসকগণ কোন নতুন রাজ্য জয়ের পর সেখানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন। পূর্ব ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাতা ইবনে বখতিয়ার খলজি বাংলা ও বিহারে অনেক মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[২০]

এ সময় একদিকে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মাশ্রয়ী শিক্ষা ব্যবস্থা, অন্যদিকে ধর্ম হিসেবে ইসলামের আগমনের সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রার বিস্তার ঘটে।[২১] মুসলিম অধিকারের শুরু থেকেই মুসলমান শাসকগণ শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগ দেন। ইবনে বখতিয়ার খলজি

লখনৌতিতে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন।[২২] সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি লখনৌতিতে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন।[২৩] উল্লেখ্য যে ভারতের সর্বত্রই প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম শিক্ষার ধারা প্রায় অভিন্নই ছিল। মুসলমান পরিবারের অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের বয়স চার বছর, চার মাস, চার দিন পূর্ণ হলে আনুষ্ঠানিকভাবে পড়াশুনায় হাতে খড়ি দিতেন। এই অনুষ্ঠানকে "বিসমিল্লাহ খানি" অনুষ্ঠান বলা হত।[২৪] একজন জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বিশেষ নির্ধারিত সময়ে শিক্ষকের নিকট শিশু তার প্রথম পাঠ গ্রহণ করতো । শিক্ষক কুরআন শরীফ হতে নির্বাচিত একটি আয়াত পাঠ করতেন এবং শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত।[২৫] অবস্থাসম্পন্ন মুসলিম পরিবারের সদস্যগণ ছেলেমেয়েদের মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতেন, আর হিন্দুরা টোলে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষালয়ে মোল্লাগণ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন। প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে শুধু হাতে খড়ি দেওয়া হতো না, সেখানে কুরআন পড়ানো হত। পরবর্তী ধাপে ছাত্রদের নির্দিষ্ট ধারা পছন্দেরও সুযোগ ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দরিদ্র ঘরের ছেলেরাও যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিল।[২৬]

উপরোক্ত তথ্যাবলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমতঃ মুসলিম ও অমুসলিম শিশুরা চার থেকে পাঁচ বছর বয়সে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করতো। দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক ধাপের জন্য বিস্তারিত পাঠ্যসূচি (প্রাথমিক/ মাধ্যমিক) নির্ধারিত হত। মুসলিম শাসনের প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার তেমন তথ্যাদি না পাওয়া গেলেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিলালিপিতে যথেষ্ঠ তথ্য পাওয়া যায়। খানকাহ, মাদ্রাসা এবং মক্তব উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হত। সুলতানী আমলে বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। শাসনকর্তা, মুক্তা, ইকতাদার, জায়গীরদার, ইজারাদার ও সৈনিকগণ অর্থনৈতিক

দিক থেকে সমৃদ্ধশালী ছিলেন ফলে তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করতেন।[২৭] মুসলমান ছেলেমেয়েদের শিক্ষা শুরু হতো মক্তবে। এসব মক্তব প্রতিটি মসজিদ এবং ধনী ব্যক্তিদের বাড়ী সংলগ্ন ছিল। ফলে প্রতিটি শহরে এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। সাধারণত মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হতো। এখানে (মক্তবে) শিশুকে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ও কোরআন থেকে আয়াত মুখস্থ করানো হত। কুরআন মুখস্ত করা একটি সাধারণ রীতি ছিল। এছাড়া রাসুলুল্লাহর (সা:) হাদিস, ফার্সি ভাষা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেয়া হত।[২৮]

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরবী, ফার্সি ও বাংলা-এ তিনটি ভাষা শিক্ষা দেয়া হত। সমগ্র মুসলমান শাসনামলে ফার্সি ছিল রাজা দরবারের ভাষা। হিন্দু বালকরা বিশেষ করে কায়স্থ পরিবারের ছেলেরা প্রায়ই মৌলভীদের নিকট মক্তবে শিক্ষা গ্রহণ করতো। হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজসরকারে চাকরি পাওয়ার আশা করতেন এবং চাকরির প্রয়োজনে এ শ্রেণীর হিন্দুরা ফার্সি শিখতেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও ফার্সি শিক্ষা দিতেন।[২৯] বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চশ্রেণীর বহু সংখ্যক হিন্দুকে মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্ন চাকরি ক্ষেত্রে দেখা যায়। রাজস্ব বিভাগের প্রায় কাজই কায়স্থদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এসব হিন্দুদেরকে অবশ্যই ফার্সি ভাষা শিখতে হতো, অন্যথায় তাদেরকে রাজসরকারে চাকুরীতে নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না।[৩০]

সুলতানী আমলের শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে ছিল সুফি সাধকদের *খানকাহ* এবং *মাদ্রাসা*। বাংলায় আগত সুফি সাধকগণ বিভিন্ন দিক থেকে জ্ঞানী ও শিক্ষিত ছিলেন। যে সকল সুফি সাধকগণ বাংলায় আগমন করেন প্রদেশের আনাচে-কানাচে তাদের *খানকাহ* প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা তাদের *খানকাহ* বা

অবস্থানকে কেন্দ্র করে শিক্ষা বিস্তারের পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। তাদের এসব খানকাহ ছিল শিক্ষা জ্ঞানচর্চা এবং আধ্যাত্মিক, মানবকল্যাণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যাবলীর এক একটি প্রধান কেন্দ্র । এসব শিক্ষাকেন্দ্র চর্তুদিক থেকে শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করত। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনকি উত্তর ভারত থেকেও শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হত।[৩১] ফলে বাংলার নগরগুলো একাধারে প্রশাসনিক কেন্দ্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র এবং বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরুপ সোনাগাঁও, সাতগাঁও, বিহার শরীফ, সিলেট ও পান্ডুয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেন বহিরাগত সুফি সাধকগণ।[৩২] তারা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। মূলত সুফিগণ ইসলামের সাম্য ও মানবতার কথা প্রচার করতে থাকেন। এছাড়া তাদের খানকাহ সবার জন্য অবারিত ছিল এবং এ *খানকাহ*কে ঘিরে শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এভাবেই বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন ধারা যুক্ত হয়। মূলত *খানকাহ* এর জন্য বরাদ্দকৃত নিষ্কর ভূমি থেকে উৎপন্ন যে কৃষিজ পণ্যসামগ্রী উদ্বৃত্ত থাকত তা থেকে *খানকাহ* সংলগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় নির্বাহ করা হত। বাংলার মুসলিম সমাজ গঠনেও এসব *খানকাহ*র ভূমিকা ছিল সক্রিয়। *খানকাহ*গুলোর প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার প্রভাবে অনেকেই সহজে ইসলাম গ্রহণ করত। তাছাড়া তৎকালীন সময়ে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের নদীগুলোর আশে পাশে অনবরত নতুন নতুন ভূ খন্ড গঠিত হচ্ছিল। কোন কোন সুফি সাধক ঐ জেগে ওঠা চর বা জঙ্গল কেটে ঐ অঞ্চলে *খানকাহ* প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে বাংলায় মুসলিম সমাজ গঠিত হয়েছিল। সমাজ গঠনের এই প্রক্রিয়ার সাথে চালু ছিল নগরায়নের প্রক্রিয়া। ফলে শুরু হয়েছিল নগরের উদ্ভব এবং দূরবর্তী অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ অর্থাৎ মৌলিক চাহিদা পুরণের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত থাকে ফলে সুফি *খানকাহ*কে ঘিরে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।[৩৩]

মাদ্রাসাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাও বাংলায় প্রচলিত হয়, কারণ সুলতান ও আমির ওমরাহগণ *মাদ্রাসা* স্থাপন ও এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং প্রচুর দানের ব্যবস্থা করেন। সুফি সাধকদের ধর্মপ্রচার এবং *মাদ্রাসা* ও মসজিদের সাথে উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং এসব শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাগ্রহণের জন্য সাধারণ মানুষের যাতায়াত বেড়ে যায়। এসব *মসজিদ মাদ্রাসা*কে কেন্দ্র করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিধি বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে পান্ডুয়া, সাতগাঁও, মান্দারন (বাকুড়া, বিষ্ণুপুর) ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। জানা যায় যে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেনশাহ পান্ডুয়ায় *মসজিদ* ও *মাদ্রাসা* নির্মাণ করেন এবং এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিষ্কর জমি দান করেন।[৩৪] নিম্নে সুলতানী আমলে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় *মসজিদ* ও মাদ্রাসাভিত্তিক যে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজশাহের সময় (১৩০১-১৩২২ খ্রিস্টাব্দ) ৭১৩ হিজরীর অর্থাৎ ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে ত্রিবেণীতে জাফর খানের সমাধিতে পাওয়া শিলালিপি থেকে জানা যায় যে জাফর খান 'দারুল খয়রাত' (পরোপকারের বাড়ি) নামে একটি *মাদ্রাসা* নির্মাণ করেন।[৩৫] সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক বহু অর্থ ব্যয়ে মককা ও মদীনায় *মাদ্রাসা* প্রতিষ্ঠিত হয় বলে সমকালীন আরব ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন।[৩৬] সমকালীন হিন্দু শাসক গণেশের পুত্র জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৫-১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ) একজন মহান নির্মাতা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তার পিতা কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত অনেক *মসজিদ* ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনি সংস্কার করেন এবং তিনি পান্ডুয়ায় *মসজিদ* ও সমাধিগৃহ নির্মাণ করেন। তিনিই গৌড় নগরীর পুনরুদ্ধার করেন।[৩৭] শিক্ষার প্রতি শাসকগণ যে অনুরাগী ছিলেন তা উপরোক্ত উদাহরণ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়।

সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ শাহের সময়ে (১৪৮১-১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ) উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে গৌড়ের মাধাইপুর অঞ্চলে 'গুনবন্ত মসজিদ' নির্মাণের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। উক্তলিপিতে সুলতানকে কুরআন শরীফের রহস্য উৎঘাটনকারী ও জ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৮] শিলালিপিতে সুলতানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির চেতনার বহি:প্রকাশ ঘটেছে। তাছাড়া সুলতান ফিরোজশাহের সময়ে (১৪৮৬-১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ) দিনাজপুরের বিরল থানায় নির্মিত *মসজিদে* প্রাপ্ত লিপিতে জনৈক নির্মাতা কিরাত খানকে 'জ্ঞানের প্রেমিক' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯]

সুলতান আলউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) ছিলেন বাঙ্গালি কবিদের সবচেয়ে উদার পৃষ্ঠপোষক ও বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে খুবই উৎসাহী। ফলে বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। এজন্যই হোসেন শাহের রাজত্বকালকে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঁর সময়ে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' (রচয়িতা যশোরাজ খান) *'মনসামঙ্গল'* ও *'মনসা বিজয়'* গ্রন্থ রচিত হয়। মূলত মুসলিম শাসনামলে বহু সংখ্যক কবি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী সংকলনের দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে উন্নত করে তুলেছিল। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময় সংস্কৃতিক্ বিকাশ ঘটেছিল সবচেয়ে বেশী। তার সময়ে অনেক কবি কাব্যচর্চা করতেন। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার অমাত্যরাও বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[৪০] আর এজন্যই শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে সুলতান হুসেনশাহের যুগের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সুলতান রাজ্যের স্থানে স্থানে *মসজিদ* নির্মাণ করে সাধুপুরুষদিগকে বহু দান করেন। তিনি নুর কুতুব-ই-আলমের সমাধি সংযুক্ত *মাদ্রাসা* ও চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য বহু গ্রাম প্রদান করেন।[৪১] এ *মাদ্রাসার* ধ্বংসাবশেষ এখনও গৌড়ের সাগরদীঘির তীরে বিদ্যমান। এছাড়া হুসেনশাহের সময়ের আরেকটি

মাদ্রাসার সন্ধান পাওয়া যায় ১৫০৩-১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে। রাজশাহীর শিবগঞ্জ থানার ঘোষপুরে একটি বড় দীঘির পূর্ব প্রান্তে এ *মাদ্রাসাটি* অবস্থিত ছিল, এর অবস্থান ছোট সোনা মসজিদ থেকে দুই মাইল দূরে।[৪২]

মুসলমান শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমোন্নতির জন্য সাধারণত বই-পুস্তক, দলিল-পত্রাদি ও অন্যান্য কাজে কাগজের ব্যবহার সম্প্রসারিত হয়। মুসলিম শাসকদের উদার শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষার দ্রুত উন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারের পথ সুগম হয়। তারাই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস প্রবর্তন করেন এবং পুস্তক অনুবাদ করে প্রচারের রীতি প্রচলন করেন। কাজী রুকনউদ্দীন সমরকন্দী ছিলেন বাংলার প্রথম যুগের খ্যাতনামা বিশিষ্ট পণ্ডিত। তিনি ছিলেন সুলতান আলী মর্দান খলজির (১২১০-১২১৩ খ্রিস্টাব্দ) সময়ের লখনৌতির কাজী। তিনিই প্রথম অমৃতকুন্ড (Amritkund) নামক অতিন্দ্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ করেন।[৪৩] শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মুসলমানদের অবদানের প্রশংসা করে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন যে, "যখন প্রথম যুগের হিন্দু লেখকগণ সাধারণরীতি অনুসারে তাদের রচিত পুস্তকাদি গোপন রাখতে ভালবাসতেন, সেই যুগে পুস্তক নকল করার এবং তা প্রচারের দ্বারা জ্ঞান বিস্তারের প্রথা প্রচলনের জন্য আমরা মুসলমানদের নিকট ঋণী।"[৪৪]

এছাড়া মুসলমান শাসকরাই প্রথম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে রাষ্ট্র ও সমাজে একটি মর্যাদাপূর্ণ আসন দান করেন। দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন যে, হিন্দু রাজাদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকলে বাংলা ভাষা রাজদরবারে স্থান লাভ করার কোন সুযোগই পেত না। এমনিভাবে মুসলমান শাসক ও আমীর-ওমরাহর

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহের ফলে হিন্দু জমিদাররা বাঙ্গালী কবিদের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের জন্য অনুপ্রাণিত হন।[৪৫]

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলা ভাষা খুব আদিম স্তরে ছিল এবং এর সুস্পষ্ট কোন রূপ ছিল না। মুসলমানরাই প্রথম বাংলা ভাষার লিখিতরূপ দান করে। সুলতানী আমলে নগরায়নের ফলে উদারনৈতিক পরিবেশে সযত্ন পরিচর্যার ফলে বাংলা ভাষা যথাসময়ে নির্দিষ্ট অবস্থান লাভ করে। জানা যায় যে মুসলমান শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের একটি সমৃদ্ধিশালী ভাষা ছিল। তারা তাদের প্রজা সাধারণের ভাষা বাংলাকে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদান করেন। মুসলিম শাসকগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং ইসলামের উদারতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কবি সাহিত্যিকদের প্রতি মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার দরুণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজমশাহ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রিস্টাব্দ) পন্ডিত ও কবিদের প্রতিভা ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেন ফলে বাংলা ভাষার উন্নতি সাধিত হয়। তার পৃষ্ঠপোষকতায় কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর *'ইউসুফ জুলেখা'* রচনা করেন। গৌড়ের শাসনকর্তার পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস *রামায়ণ* কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন (১৪৯৩-১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ)।[৪৬]

১২০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিখ্যাত গ্রন্থাবলী হল কবি শাহ মুহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ জুলেখা*, কবি ফয়জুল্লাহের-*গোরখ বিজয়*, *গাজী বিজয়*, সত্যপীরের পাঁচালী, জয়নালের *চৌতিষা* ও *রাজমালা*। কবি জৈনুদ্দিনের- *রসুল বিজয়*, মুহাম্মদ কবীর-মনোহরের *মধুমালতী* প্রভৃতি।[৪৭] এছাড়া হিন্দু কবি কানা হরিদত্তের *মনসামঙ্গল*, রামাই পন্ডিতের- *শুন্য পুরাণ*, বিদাপতির *পদাবলী*, মালাধর রসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ বা

মনসামঙ্গল, বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্য ভাগবত*, কৃষ্ণদাস কবিরাজের *শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত* এছাড়াও ২৯ জন কবির মূল্যবান রচনাবলী বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণে গুরুত্বপর্ণূ ভূমিকা পালন করেছে।[৪৮] মুসলমান খেলাফত যুগের খ্যাতনামা পূর্বসূরীদের নিকট থেকে মুসলিম শাসকগণ একটি মূল্যবান শিক্ষা পদ্ধতি ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য উওরাধিকার সূত্রে লাভ করে। রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে এ উপমহাদেশে তারা তাদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা নিয়ে আসে। জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন যে, "ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভারত আক্রমণ কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটা যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে।[৪৯]

প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা এ উপমহাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বজনীনতা ও উদারতার আদর্শ তুলে ধরে। এমনকি ভারতে মুসলমান সুফি দরবেশগণ যারা কেবল মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানে ব্যপৃত ছিলেন, তারাও তাদের শিষ্যদের শিক্ষার প্রতি জোর দিয়েছেন এবং যথার্থভাবে শিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁরা শিষ্যত্বে বরণ করেননি। এমনকি শিক্ষার প্রতি এ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা শুধুমাত্র মুসলমান পুরুষদের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিলনা, নারী-পুরুষ এমনকি নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও শিক্ষাগ্রহণে সমান সুযোগ সুবিধা পেত।[৫০]

সুলতানদের একটি বড় অবদান হচ্ছে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্ম ও মানুষের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি ও সেবার হাত প্রসারিত করে রাখা। সুলতান ছিলেন হিন্দু সমাজের অভিভাবক এবং হিন্দুদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নতির পৃষ্ঠপোষক। তিনি অন্যায় ও অনিষ্টের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করেছেন এবং এর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। হিন্দুদেরকে তাদের ধর্মীয়

ও সামাজিক কার্যাবলীতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। মুসলমান শাসনের উদার ও নিরপেক্ষনীতির ফলে হিন্দুরা নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো। তারা হিন্দু প্রজাদের প্রতিভা এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতির জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাছাড়া মুসলমান শাসন ও হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সংস্পর্শের ফলে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য খর্ব হয় এবং তাদের অধীনতা থেকে অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুরা বহুল পরিমাণে মুক্তিলাভ করে। ব্রাহ্মণরা ধর্ম ও শিক্ষার উপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল, অথচ অন্যান্যদেরকে সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। মুসলিম শাসনামলে নিম্নশ্রেনীর হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো পঠন, লিখন ও পর্যালোচনায় সাহসী হয়।[৫১] মূলত বাংলায় নগরায়নের ফলে ও সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মানুষের উপরোক্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহন করা সম্ভব হয়েছিল।

৪. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নগরায়নের প্রভাব

সুলতানী আমলের নগরায়নের ফলে বাংলার সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়। এ সময়েই নগরায়নের প্রক্রিয়া দ্রুত কার্যকর হয়েছিল এবং মুসলিম শাসকবৃন্দ শহরের দরজা সকলের জন্য খোলা রাখতেন ফলে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় কারণ মুসলিম অভিজাত শাসকদের আগমনের ফলে উন্নয়নশীল নগর কেন্দ্রসমূহ সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। সামাজিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন নগর ও বন্দরের উত্থান, শিল্প প্রতিঠান প্রতিষ্ঠা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল, ফলে বিভিন্ন পেশার লোকজন গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হতে থাকে। বিভিন্ন ধরণের নগর কেন্দ্র গড়ে

উঠার সাথে সাথে টাকশাল নগরীও গড়ে ওঠে, এবং কড়ির পরিবর্তে একক মান সম্পন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ফলে বাংলার মুদ্রাভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও বহি:বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি পর্যায়ক্রমে নগর অর্থনীতি তথা মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয়; যা মুসলিম বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তৎকালীন বাংলায় মুসলিম ও অমুসলিমদের সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থা। সুলতানী আমলের নগরায়নের প্রভাব পড়েছিল সাধারণ জনগণের খাদ্যদ্রব্যে, উৎসবাদি, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকারাদি, সামাজিক নৈতিকতা, সতীদাহ প্রথা, দাস ব্যবসা প্রভৃতির ক্ষেত্রে। [৫২]

৪.১ খাদ্যদ্রব্য

প্রাক-মুসলিম যুগে বিভিন্ন মাংস খাবারের ব্যাপারে বিশেষ বিধি-নিষেধ আরোপিত ছিল। জানা যায় যে ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজে মোরগ, হাঁস, গরু ইত্যাদি খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিল।[৫৩] তারা নিরামিষভোজী ছিল। এছাড়াও হিন্দুরা বিভিন্ন ধরণের উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করতে এবং ক্ষুধা উদ্রেকের জন্য আচারের ব্যবহার জানত না। হিন্দুদের ভোজ ও সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনায় কোথাও আচারের কোনো উল্লেখ নেই। তাছাড়া প্রাক-মুসলিম যুগে ফলমুলের মধ্যে দেশীয় কয়েক জাতের ফলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মুসলমান শাসনামলে বাঙালীর খাদ্যদ্রব্যে বিলাসিতার ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। সুলতানদের ব্যাপক নগরায়ন প্রক্রিয়ার ছোঁয়া বাঙালীর খাদ্যাভাসের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। সিবাস্তিয়ান মানরিক এবং চীনা দূতগণের বর্ণনা থেকে মুসলমানদের খাদ্য সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। মুসলমানগণ তাদের খাবারে ভাত, রুটি, বিভিন্ন রকম মাংস (গরু, খাসি, হাঁস) এবং রোস্ট

করা মাংস (roasted meat) পরিবেশন করত। তাদের খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় আরো সংযোজন করা হতো বিভিন্ন ধরনের মাছ, দুধ, ঘি, মাখন, দই ইত্যাদি। মুসলিম যুগে এসে ফলমূলের মধ্যে দেশীয় কয়েক জাতের ফল প্রতিদিনকার খাদ্য তালিকায় একটি বড় অংশ জুড়ে অবস্থান করত। এছাড়াও শসা, লেবু, মূলা, কাঁচা লঙ্কা ইত্যাদির তৈরি নানা জাতীয় আচার ছিল মুসলমানদের খাদ্যের বিশিষ্ট অঙ্গ। সিবাস্তিয়ান মানরিক বলেন, এগুলো ক্ষুধা বৃদ্ধি করতো এবং আবার খাবারের দিকে আকৃষ্ট করতো। পরবর্তীতে হিন্দুরা এটি মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করেছিল।[৫৪] তবে উৎসবাদিতে মুসলমানেরা হিন্দুদের মত মাছ, মাংস, শাকসব্জি ও মিষ্টান্ন পরিবেশন করত, অর্থাৎ সমাজে মিথস্ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। উচ্চবিত্তদের খাবারের তালিকায় ছিল বিভিন্ন রকমের ফল যেমন তরমুজ, আম, কাঠাল ইত্যাদি। তাছাড়া বিভিন্ন রকমের মিষ্টিও এ তালিকার মধ্যে ছিল। সন্দেশ ছিল জনপ্রিয় খাবার।[৫৫] চৈনিক পর্যটকগণ উল্লেখ করেছেন যে, এরা রাতে মদপান করত; উৎসব ও বিবাহের ভোজের পরও মদপান করত। স্ত্রী লোকেরাও এসব মদ খুব ভালবাসত, এতেই তারা অভ্যস্ত। খাবার গ্রহনের পর তারা মিষ্টি পানীয় (sweeted water) ও গোলাপ জল (rose water) মিশ্রিত শরবত পরিবেশন করত।[৫৬]

প্রকৃতপক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নতুন সামাজিক রীতি প্রধানত খাদ্যাভাস, বাংলার ও বহিরাগতদের রীতিনীতি, শহরে জনসাধারণের চাহিদানুযায়ী গড়ে ওঠা বিভিন্ন দ্রব্যাদির দোকান বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল। ইবনে বতুতা সোনারগাঁ ও চট্টগ্রামের বাজারে গবাদি পশুর এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যাদির দামের কথা উল্লেখ করেন।[৫৭] মাহুয়ান তথ্য দিয়েছেন যে, বাজারের রাস্তাঘাটে বিভিন্ন ধরনের দোকান যেমন, গোসলখানার স্থাপনা সরঞ্জামাদি, মদের দোকান, খাবারের দোকান, মিষ্টির

দোকান এবং অন্যান্য দোকান প্রভৃতি চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতির কার্যক্রম নির্দেশ করে। ইজাজ-ই-খসরু উল্লেখ করেন যে, তৎকালীন সময়ে শহরগুলো অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।[৫৮]

পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকে চীনা পরিদর্শক দল পাওয়া পরিদর্শনে এলে সুলতানগণ তাদের 'ঝলসানে ও রোস্ট করা গরু ও খাসির মাংস, গোলাপজল, বিভিন্ন সুগন্ধিযুক্ত শরবত ও পান সুপারি দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সময় জিয়াউদ্দীন বাবানীর *'তারিখ-ই-ফীরূজশাহী'* গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের শুকনো ফলমূল, মাংসের রেজালা, পানীয়, পান-সুপারী প্রভৃতি খাদ্যের যতদূর সম্ভব সর্বোপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে মিনহাজ উদ্দীন কায়কোবাদ(১২৮৭-১২৯০ খ্রিস্টাব্দ) এর আমলে বিস্তারিত খাদ্যতালিকা ও সেগুলি পরিবেশনের নিয়মাবলী পাওয়া যায়। আমির খসরু তাঁর *কিরাণ-আস-সাদাইন* এ আপ্যায়ন সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, অতিথিদের প্রথমে ফলের রস ও চিনির শরবত, পরে বিভিন্ন ধরনের রুটি যেমন, নান-ই-তামুরি এবং কেক এরপর ভাত ও মাংস দেয়া হতো।[৫৯] অন্যান্য খাবারের মধ্যে সমুচা, রোস্ট করা ছাগল ছানা, ছাগলের মাথা ও জিহ্বা, ভেড়ার পায়ের ফ্রাই(ভাজা), দুম্বার লেজ, বিভিন্ন ধরনের পাখি ও মুরগী এবং মাখন উল্লেখযোগ্য। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি খাদ্য তালিকায় থাকতো যেমন, হালুয়া ও সাবুনি ইত্যাদি। সবশেষে পান-সুপারি পরিবেশন করা হতো।[৬০]

ইবনে বতুতা দুটি অনুষ্ঠানের খাদ্য তালিকার কথা উল্লেখ করেছেন প্রথমত: বিদেশীরা মুহাম্মদ বিন তুঘলক এর শাসন আমলে ভ্রমণকালে রাষ্ট্রীয় ভোজন

সভা। দ্বিতীয়তঃ সুলতানরা যে ব্যক্তিগত ও জনসাধারণের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করতেন তিনি আরও ঘি ও মুরগীর মাংস দ্বারা রান্না পোলাও ও ভারতীয় কাচ্চি বিরিয়ানীর কথা উল্লেখ করেছেন। বিদেশী খাদ্য তালিকার মধ্যে নিহারী ও কাচ্চি বিরিয়ানীর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬১]

৪.২ উৎসবাদি

বাঙালী অত্যন্ত আমোদপ্রিয় জাতি। খেলাধুলা, নাচ-গান, অভিনয় ও বিভিন্ন উৎসবাদিতে প্রচুর রঙ-তামাশা করা বাঙালীদের স্বভাবজাত বিষয়। তবে মুসলমানগণ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব উৎসবগুলো সাধারণ ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করেই বেশী অনুষ্ঠিত হত। যদিও ইসলাম একটি ঐশ্বরিক ধর্ম এবং এর অনুষ্ঠানাদি সাধারণ ও আড়ম্বরহীন। তথাপি বাংলার মুসলমানেরা এই উৎসবগুলোকে বিরাট আনন্দ উৎসবে পরিণত করে। *তাবাকাত-ই- নাসিরী* থেকে জানা যায় যে, সুলতানগণ রমজান মাসে দৈনন্দিন ধর্মীয় আলোচনার ব্যবস্থা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারক নিযুক্ত করেন। [৬২] সুলতানী আমলে ব্যাপক নগরায়নের প্রভাব বাংলার উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। তখন ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্মবার্ষিকী (ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী), শব-ই-বরাত, মহররম উৎসব পালন বাঙালী মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হয়ে উঠে।

শিশুর জন্ম হলে বিশেষ করে পুত্র সন্তানের জন্ম উপলক্ষে সমাজে আনন্দ উৎসবের প্রথা ছিল। বন্ধু-বান্ধবরা সৌভাগ্যের অধিকারী পিতাকে অভিনন্দন জানাতেন। মস্তবড় ভোজ দেয়া হত এবং মেহমানদেরকে উপহার সামগ্রী দেয়া হতো। এই উপলক্ষে হাতির লড়াইয়ের ব্যবস্থা করা হতো।[৬৩]

বিয়ে শাদিতে খুব আমোদ-প্রমোদ ধুমধাম ও ব্যাপক লোক সমাগম হতো। মুসলমানদের মধ্যে বরপক্ষ কনে পক্ষকে পণ দিত। কনের পিতা কখনো কখনো বর ও বরপক্ষকে উপহার প্রদান করতেন। কিন্তু সেটা তাঁর পক্ষে কোন প্রকার বাধ্যতামূলক ছিল না, অথচ হিন্দু আমলে (প্রাক মুসলিম যুগে) বরকে মূল্যবান যৌতুক প্রদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। এমনকি তাদের নিম্নশ্রেণীর ভেতরেও কনের পিতা বরকে যৌতুক প্রদান করতে বাধ্য হতো। ঘটককেও মোটা অংকের পুরস্কার দিতে হতো।[৬৪]

৪.৩ পোশাক-পরিচ্ছদ

মুসলমানদের বাংলা বিজয় পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও একটি সূদুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রাক-মুসলিম যুগে নারী-পুরুষের লজ্জা নিবারণে পোশাকের দৈন্যতা নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষ্যে ফুটে উঠেছে "সেকালের মেয়েরা শাড়ির সাহায্যে উত্তরবাস রচনা করে আবরুর প্রয়োজনবোধ করতেন না। ওপরের গা খালি রাখাই রীতি ছিল ।"[৬৫] অন্যদিকে সুলতানী আমলে মুসলিম নারী ও পুরুষের পোশাকে আভিজাত্য ও শালীনতার প্রভাব সুস্পষ্টরূপে ফুঠে উঠে। দৈনিক বর্ণনানুসারে, উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণ ইজার বা পায়জামা এবং গোলাকৃতি কলারের ঢিলা পোশাক (গাউন বা লম্বা শার্ট) পরিধান করতেন। এ শার্ট একটি বড় রঙিন রুমাল দিয়ে কোমরে বাঁধা থাকত। তাঁরা সাদা সুতি পাগড়ী ব্যবহার করতেন।[৬৬] পর্তুগীজ পরিব্রাজক ডুয়ার্তো বার্বোসা (১৫১৬-১৫১৮) 'বাঙ্গালাহ' শহরের সভ্রান্ত মুসলমানদের এ ধরণের পোশাক লক্ষ্য করেছেন। তিনি আরও লক্ষ্য করেছেন যে, তারা তাদের হাতের আঙ্গুলে মুক্তাবসান আংটি ও মাথায় উৎকৃষ্ট সুতি টুপী পরিধান করতেন।[৬৭] সাধারণ মুসলমানদের পোশাকের উল্লেখ করে বার্বোসা বলেন, "সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা খাট সাদা শার্ট পরিধান করে এবং এগুলো উরুদেশ মাঝামাঝি পর্যন্ত

প্রলম্বিত থাকে। তারা তিন প্যাঁচের ক্ষুদ্র শিরাবরণ ব্যবহার করে। তাদের সকলেই চামড়ার জুতা ব্যবহার করে এবং অন্যান্যরা উত্তমরূপে কারুকার্য করা রেশমী অথবা সোনালী সুতায় সেলাই করা চপ্পল পরিধান করে থাকে।[৬৮] বার্বোসা সাধারণ মুসলমানদের পোশাকরূপে পায়জামা, খাট শার্ট ও ছোট পাগড়ীর কথা উল্লেখ করেছেন; প্রকৃতপক্ষে এগুলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের পরিধেয় পোশাক ছিল।[৬৯]

অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিচ্ছদ পরতেন। তারা কামিজ (শার্ট) ও সালোয়ার (পাজামা) বা স্কার্ট পরিধান করতেন। রমণীদের পোশাক সম্বন্ধে উল্লেখ করে চৈনিক দূতগণ বলেন, "মেয়েলোকেরা খাট জামা পরিধান করত, এ সবের চারদিকে ভাঁজ করা একখন্ড সুতি কাপড়। সিল্ক কিংবা বুটিতোলা রেশমী বস্ত্র থাকত। মুসলমান মহিলাদের স্বাভাবিক সুন্দর ফর্সা রঙ সম্বন্ধে বিদেশীদের বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের কোন প্রসাধন দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল না। তাদের গলার চতুর্পাশে ঝুলান কাপড় রাখত এবং পেছনে খোঁপা বেঁধে তারা তাদের কেশবিন্যাস করতো। তাদের হাতের কব্জিতে ও পায়ের গোঁড়ালিতে সোনার বলয় থাকত এবং হাত পায়ের আঙ্গুলীতে আংটি ব্যবহার করতো।"[৭০] বার্বোসা বর্ণনা করেন যে, রমণীরা অতি মূল্যবান পোশাক এবং রেশমী ও মুক্তা বসানো স্বর্ণের অলংকারাদিতে ভূষিতা হতেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, "বাংলার সম্ভ্রান্ত মুররা পরিধান করে লম্বা মরিসকো জামা; এগুলো সাদা রঙের; এদের বুনানি হালকা এবং পায়ের উপর পর্যন্ত প্রসারিত; ভিতরে তারা পরে এক ধরনের বস্ত্র তা কোমরের নীচে জড়ানো থাকে। এদের জামার উপরে কোমর ঘিরে জড়ানো থাকে একটি রেশমী বন্ধনী (sash) এবং রুপা বসানো ছোরা। তারা আঙ্গুলে রত্নখচিত আংটি পড়ে এবং মাথায় দেয় মিহি সূতী-কাপড়ের তৈরী টুপি।"[৭১] সাধারণ স্তরের পুরুষেরা খাটো

সাদা জামা পরে, সেগুলো উরুর আধখানা অবধি প্রসারিত। এরা পায়জামা (drawers) পড়ে এবং মাথায় তিন চার পাক দিয়ে ছোট পাগড়ী জড়ায়। এরা সবাই চামড়ার জুতো পায়ে দেয়; কেউ পরে বড় জুতো (shoe), কেউ পড়ে খুব সুন্দরভাবে তৈরী রেশমী এবং সোনালী সুতা দিয়ে সেলাই করা চটি জুতা। চৈনিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সুলতান ও অভিজাতবর্গ রাজদরবারে মাথায় টুপি পরিধান করতেন।[৭২] অভিজাতরা মোজা পরিধান করতেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানরা টাওজার ও শার্ট পরিধান করতেন। শাহ মুহাম্মদ সগীর উল্লেখ করেন যে, মুসলিম বালকগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করত।[৭৩]

বাংলার কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী সাধারণত লুঙ্গি, ছোট শার্ট এবং টুপি পরিধান করত।[৭৪] সুলতানী বাংলার মুসলমান সুফিদের জোব্বা ও পাগড়ী বা খাল্লা (kulah) ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় পোশাক। ফেইসিন উল্লেখ করেন যে, উচ্চশ্রেণীর মহিলারা নকশি করা রঙিন সিল্কের শাড়ী (kanculi) পরিধান করে।[৭৫]

৪.৪ অলংকারাদি

প্রাক-মুসলিম যুগে উচ্চ শ্রেণীর মহিলারা সোনা ও রূপার অলংকার পরিধান করতেন। তবে সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং গরীব গৃহস্থদের ভাগ্যে এসব জুটতনা; বড়জোর শঙ্খবলয়, কচি তালপাতার কর্ণাভরণ, ফুলের মালা, লাউয়ের বিচির তৈরী গহনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। তৎকালীন সময়ের মেয়েদের সাজ-সজ্জার বর্ণনা দিয়ে নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, কপালে কাজলের টিপ, হাতে সাদা পদ্ম ডাটার বালা, কানে কচি রিঠা ফুলের দুল, আর সিগ্ধ চুলের

খোঁপায় তিলের পল্লব- পল্লীবাসী বধুদের এই বেশ পথচলতি মানুষের গতিবেগ মন্থর করে দেয়।[৭৬]

সুলতানী আমলে সৃষ্ট নগরায়নের প্রভাবে বাঙালী সাধারণ নারীদের মধ্যেও ব্যাপক অলংকার ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। অতি সাধারণ স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত নানা রকমের শাড়ি বা গাগরা এবং চোলি পরিধান করতো এবং কানের দুল ও নোকের আংটি ব্যবহার করতো। বিভিন্ন অলংকারের উল্লেখ স্থানীয় লোক সঙ্গীতে পাওয়া যায়। তারা নানা প্রকার রৌপ্য অলংকার ব্যবহার করতো। র‍্যালফ ফিচ লিখেছেন, মেয়েলোকেরা বহু রূপার গহনা তাদের গলায় ও বাহুতে পরিধান করতো। তারা পায়ে রূপা, তামার এবং হাতির দাঁতের আংটি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করতো ।[৭৭]

সুলতানী আমলে বাংলার নগরায়নের ছাপ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদাযের অলংকার ও সাজ সরঞ্জামে পরিলক্ষিত হয় । উচ্চবিত্ত মহিলারা সোনা, হীরা, মুক্তা, মরকত, চুনি ও রত্নখচিত ঘুঙুর পরিধান করত। চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মহিলারা মাথায় সিঁদুর ও টায়রা পড়ত এবং নাকে নথ পড়ত। তাছাড়া সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা গলায় হার ও নখে আংটি পড়ত।[৭৮] মূলত তারা হাতে বালা, চুড়ি, কংকণ, আংটি এবং পায়ে নূপুর পরিধান করত। এছাড়া মুসলমান পুরুষ, মহিলা শিল্পীগণ (নর্তক/ নর্তকী) ব্যেসলেট পড়ত।[৭৯]

৪.৫ সামাজিক নৈতিকতা

মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের প্রাক্কালে হিন্দু সমাজ অধ:পতিত ছিল। অব্রাহ্মণদের উপর বিশেষ করে নিচুশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারই ছিল না, সব রকমের দুর্নীতি ও অনাচার সামাজিক জীবনকে

কলুষিত করেছিল। অপরপক্ষে, মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পরে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাবের ফলে হিন্দু সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধিত হয়। মুসলমান সমাজ মার্জিত ও পবিত্র নৈতিক জীবনের আদর্শ তুলে ধরে । হিন্দুরা তাদের জীবনের সংস্পর্শে আসে এবং আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে হিন্দুদের উপর মুসলমান পীর দরবেশের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। মুসলিম শাসনে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব লোপ পায়; এ ব্রাহ্মণরা হিন্দুদের সামাজিক অসাম্য ও নৈতিক অধ:পতনের জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী ছিল। মুসলিম শাসন সকল শ্রেণীর হিন্দুদের বুদ্ধিবৃত্তিক নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে দেয়।[৮০]

৪.৬ সতীদাহ প্রথা

সতীদাহ প্রথা বা মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীর সহমরণ ছিল হিন্দুদের একটি সামাজিক প্রথা। তবে এতে স্ত্রীর ইচ্ছাকে গুরুত্ব না দিয়ে সহমরণে বাধ্য করা হত। সুলতানী আমলে বাংলার নগরায়নের ফলে উন্নত জীবন-ব্যবস্থায় এরকম একটি অমানবিক প্রথার বিলোপ ঘটতে থাকে। আলোচ্য সময়ে হিন্দুদের মধ্যে 'সতী' (রীতি) ছিলো স্বেচ্ছামূলক । ইবনে বতুতা, আবুল ফজল, বার্নিয়ার ও অন্যান্য লেখকদের তথ্য থেকে জানা যায় যে, উত্তর ভারতের হিন্দু সমাজে এই প্রথা কড়াকড়িভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মুসলমান শাসকগণ মানবতার খাতিরে এ প্রথা রহিত করেন যাতে জোরপূর্বক কোন বিধবাকে মৃত স্বামীর অনুগমন করতে বাধ্য না করা হয়।[৮১]

সুলতানী আমলে মুসলমান শাসনকর্তাগণ আইনের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। একজন সামান্য নারী বা পুরুষ একজন শক্তিশালী সুলতানের বিরুদ্ধেও নালিশ করতে পারত এবং অধিনস্ত কর্মচারী কাজী সুলতানকে পর্যন্ত

একজন সাধারণ আসামীরূপে বিচারালয়ে ডেকে পাঠাতে পারতো। কথিত আছে যে একদা সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ যখন তীর নিক্ষেপ অভ্যাস করছিলেন তখন আকস্মিকভাবে একটি তীর একজন বিধবার পুত্রের গায়ে বিদ্ধ হয় এবং সে মারা যায়। পুত্র হারা মা কাজীর দরবারে পুত্র হত্যার অভিযোগ আনে। কাজী সুলতানকে একজন সাধারণ বিবাদীর মতো আর্থিক জরিমানা করেন এবং সুলতান নিজেও এ ঘটনায় কাজীর প্রশংসা করেন এবং হৃষ্ঠচিত্তে মহিলার প্রাপ্য জরিমানা প্রদান করেন। এতে তৎকালীন সময়ে বাংলার সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে।[৮২]

৪.৭ দাস ব্যবসা

সুলতানী আমলে নগরায়নের প্রভাবে বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ফলে সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে বাংলায় দাস ব্যবসার প্রচলন ছিল। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। পর্যটক ইবনে বতুতা উল্লেখ করেন যে, উপপত্নীরূপে সেবাদানের উপযুক্ত একজন সুন্দরী যুবতীকে এক স্বর্ণ দিনারে আমার সম্মুখে বিক্রি করা হয়। এছাড়া আমি নিজেও আশুরা নামে একজন দাসীকে ক্রয় করেছিলাম।[৮৩] বণিকগণ বিদেশ থেকে এবং বেশিরভাগ আবিসিনিয়া থেকে ক্রীতদাস আমদানী করত। প্রত্যেক ধনী ব্যাক্তি সেবার জন্য ক্রীতদাস ও খোজা নিয়োগ করতেন। পর্যটক বার্বোসা উল্লেখ করেন যে, "এ শহরের মুর দেশীয় বণিকগণ দেশের অভ্যন্তরে চলে যায় এবং পিতামাতা ও অন্যান্যদের নিকট থেকে বহু ছেলেমেয়ে ক্রয় করে আনে। এরা এ ধরনের ছেলেমেয়েদের চুরি করে নিয়ে খোজা বানায়।"[৮৪] আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে, শ্রীহট্ট ও ঘোড়াঘাট থেকে বহু সংখ্যক খোজা সরবরাহ করা হয়।[৮৫] এ ঘৃণ্য প্রথা যে বাংলায় প্রচলিত ছিল তা পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের আত্মজীবনী থেকেও জানা যায়।

৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নগরায়নের প্রভাব

প্রযুক্তির পরিবর্তন বা নতুন ধরণের প্রযুক্তি সাধারণত উন্নত সভ্যতা থেকে আসে বা গ্রহণ করা হয়। মুসলমানগণ বাংলার আগমনের সাথে নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় নতুন প্রযুক্তি এসেছিল। বিজয়ীরা এদেশের বিশাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন। তাছাড়া ভারতীয় কারিগরেরা ও বাংলার কারিগরদেরকে শিল্প ও প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করেছিল।

এছাড়া বাংলায় নগরায়নের পর শিল্প কারখানা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতিবস্ত্রের জন্য বাংলা বিখ্যাত ছিল। নগরায়নের ফলে বাংলার কারিগরেরা প্রথম সুতা কাটার জন্য 'চরকা' ব্যবহার শুরু করে।'চরকা' ফার্সী শব্দ 'চরখা' থেকে এসেছে। পূর্বে হাতে ঘোরানো নাটাই ও তকলি দিয়ে সুতা কাটা হত। তকলি দেশি শব্দ এর ফার্সি শব্দ হল দুক্। [৮৬]

১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে লেখা ইসামীর '*ফুতুহ-আস-সালাতীন*'এর উদ্ধৃতি থেকে ইরফান হাবিব যুক্তি দেখিয়েছেন যে, চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর ভারতে সুতা কাটার যন্ত্র চরখা ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল আর বাংলায় এ যন্ত্র চালু হয়েছিল চৌদ্দ শতকের শেষের দিকে।"[৮৭] ফলে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রসম্ভার বিশেষ করে মোটা সুতি বস্ত্রগুলো পনের শতকের প্রথম দিকেই এদেশে প্রচুর পরিমানে তৈরি হয়। পর্তুগীজ পর্যটক ডুয়ার্তো বার্বোসার (১৫১৬-১৫১৮) বিবরণ থেকে জানা যায় যে লোকজন চরখায় সুতা কেটে বস্ত্র বয়ন করে। বাংলায় বেশি পরিমানে তুলো উৎপন্ন হত বলে শহর বন্দরগুলোতে এবং গ্রামাঞ্চলে বস্ত্রশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। মূলত মোটা সুতি কাপড় তৈরির জন্য এবং তুলা থেকে মোটা সুতা আলাদা করার জন্য চরকার ব্যবহার

করা হত। ফলে চরকায় প্রতি কাটুনী উৎপাদন ছয় গুণ বেড়ে যায়। অন্যদিকে বাংলার মসলিন জাতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের কাজে ব্যবহৃত হত আদিম যন্ত্র টাকু বা তক্‌লি। বাঁশের তৈরি সুচের মত যন্ত্র তক্‌লি ফাপা খোলকের (shell) উপর ঘুরিয়ে বয়নকার্য সম্পন্ন করা হত।[৮৮]

বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হলো ধুনন যন্ত্র। একটি কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে অন্ত্র যোগ করে তৈরি একটি কামান বা ধনুক বা কাষ্ঠনির্মিত এক বা একাধিক মন্ডর নিয়ে এই যন্ত্র তৈরি। এই ধুনন যন্ত্র অত্যন্ত দ্রুত তুলা পেঁজার কাজ সম্পন্ন করত।[৮৯]

রেশম কীটের লালন এবং রেশমী সুতা তৈরির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন কারিগরি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পনের শতকের প্রথম দিকের চীনা পর্যটক মাহুয়ান বাংলায় এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলেন। তাছাড়া বার্বোসা ও ট্যাভারনিয়ারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, গুজরাটের ক্যাম্বে, আহমদাবাদ ও সুরাটে রেশমি বস্ত্র তৈরি হত বাংলা থেকে প্রেরিত অপরিমার্জিত রেশম দিয়ে।[৯০] এই কাঁচামালের ক্ষেত্রে বাংলা স্বয়ংসম্পন্ন হতে পেরেছিল বলেই পনের শতক থেকে শুরু করে সতের শতকের মধ্যেই এদেশে রেশম শিল্প পুরোপুরিভাবে বিকাশ লাভ করেছিল।

সুতা তৈরির জন্য চরকা ছাড়া আরো দুটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছিল প্রথমটি ছিল কাঠের তৈরি এক ধরনের ফাঁদ, যার দুটো করে রোলার থাকত, এদুটি দাঁতে দাঁতে এমনভাবে লাগানো হত যাতে একটি অন্যটির বিপরীত দিকে ঘুরতে পারে। রোলারগুলোর মধ্যে তুলা ঢুকিয়ে দিলে বীজ থেকে তুলা আলাদা করা যেত। দ্বিতীয় যন্ত্রটি ধুনগুর্ন যার কম্পনের সাহায্যে তুলা ও আঁশ আলাদা করা

যেত। চরকিতে উৎপাদন খালি হাতের উৎপাদনের থেকে চার- পাঁচ গুণ বেশি হত। এসব চরকিতে দুটো যন্ত্র ছিল সমান্তরাল প্যাঁচ বা গিয়ার, আগে ও পেছনে নেয়ার হাতল বা ক্রাংক। সমস্ত যান্ত্রিক প্রযুক্তির মধ্যে গিয়ারই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রযুক্তি কারণ এর সাহায্যে সমান্তরাল গতিকে খাড়া ও নিচু গতিতে বদলানো সম্ভব হত। এছাড়া বিজিত তুর্কীরা তাদের ঘোড়ার খুরে লোহার পাত লাগাত। ফলে তাদের ঘোড়া সওয়ার বাহিনীর গতি ও ভেদশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৯১]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে মুসলমানরা মদ প্রস্তুতকরণ শিল্প হিসেবে আখের রস দিয়ে মদ চোলাই করার নতুন প্রযুক্তি শুরু করেছিল।[৯২] বাংলার অন্যান্য সব শিল্প কারখানায় বা শিল্পজাত দ্রব্যাদি তৈরিতে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

সুলতানী আমলের নগরগুলোর অল্প কিছু ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। এসব নগরের সমৃদ্ধির চিহ্ন হল প্রাসাদ ও স্থাপত্যসমূহ। প্রাসাদ ও সৌধ তৈরির প্রযুক্তি বাংলায় প্রথম মুসলমানগণ ব্যবহার করে। তার নিদর্শন খিলান ও গম্বুজে পাওয়া যায়। আবার চুন সুরকি দিয়ে ইট গাথাঁর ব্যবহার মুসলমানদের সঙ্গেই এসেছিল।

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসনামলে প্রথম খিলান (true arch) ও গম্বুজ (dome) ব্যবহার করা হয় এ পদ্ধতি তারা সাসানীয় স্থাপত্য থেকে গ্রহণ করেছিল। তৎকালীন সময়ে নানা রকমের ও নানা আকৃতির মিনা করা কাচেরন্যায় মসৃণ টাইল্‌স ও ইটের ব্যবহার করা হয়। মুসলমান আমলের যেসব ইমারত এখন পর্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে সেগুলো চতুর্দশ শতাব্দীর পরে

নির্মিত। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হম্যের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে হুগলী জেলার ত্রিবেণী ও ছোট পান্ডুয়ায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ত্রিবেণীতে জাফরখান (১২৯৮ খ্রিস্টাব্দ) গাজির মসজিদে টেরাকোটার ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সিকান্দার শাহ কর্তৃক নির্মিত আদিনা মসজিদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। মসজিদটিতে অনেকগুলো স্তম্ভ রয়েছে এবং উত্তরে আট ফুট উচুঁ মোটা, খাটো ২১টি কারুকার্যখচিত স্তম্ভের উপর *বাদশাহ কি-তক্ত* (badsha-ki-takt) বা মহিলাদের বসবার মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। যা ছিল সুলতানী আমলে সবচেয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদটি উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন যার দেওয়ালের পাঁথরের গায়ে অনেক রকম চিত্র ও নকশা খোদিত আছে। এছাড়া গৌড়ের বড় সোনা মসজিদটিতেও নুসরাত শাহ ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে একটি উচ্চ মঞ্চ ছিল অনেকটা আদিনা মসজিদের *বাদশাহ কি-তক্তের* (ladies gallary) ন্যায়। স্থাপত্য ছাড়াও বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তি লক্ষ্য করা যায় সমাধী সৌধগুলোতে। যেমন গৌড়ের আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সমাধীর গায়ে ইটের তৈরি মিনারের উপরিভাগ পোড়ামাটির নানা নকশা এবং নীল ও সাদা রংয়ের মসৃণ টালি ব্যবহৃত হয়েছিল। মসজিদ বাদ দিলেও তোরণকক্ষ বা মিনার সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। [৯৩]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সুলতানী আমলের নগরায়নের প্রভাব পর্যলোচনা করলে দেখা যায় যে, কৃষি কাজে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বাজারী পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও নগদ টাকার লেনদেন বেড়ে যায়। ফলে বড় লনীকারী কৃষক ও বণিকদের হাতে বেশি টাকা আসতে থাকে এবং শ্রেণী সম্পর্ক আরো দৃঢ় হতে থাকে। এছাড়া তুর্কিরা তাদের ঘোড়ার খুড়ে লোহার পাত ব্যবহার করতো। ফলে তাদের ঘোড়া সওয়ার বাহিনীর গতি ও ভেদশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সওয়ারের নতুন প্রযুক্তির ফলে ছোট ও সীমাবদ্ধ শাসকবর্গের হাতে ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সফলতা পায় বাংলার নগরায়ন ।

সুলতানী আমলের নগরায়ন বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিজয়ী এবং বহিরাগত মুসলমান শাসকগণ ছিল প্রাণ-চাঞ্চলে ভরপুর, অসমসাহসিক ও উদ্যোগী এবং বাংলার মুষ্টিমেয় মুসলিম অধিবাসীদেরকে তারা আর্থিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিকভাবে শক্তিশালী করে তোলে ফলশ্রুতিতে এ প্রদেশে নতুন জীবনের সঞ্চার হয়।

তথ্য নির্দেশ

১. মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৪

২. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, vol.1, Karachi, 1963, p. 341

৩. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫

৪. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ২২৩

৫. *Visva Bharati Annals,* vol.1, 1945, pp. 96-134

৬. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২৭

৭. ঐ

৮. ঐ

৯. মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৯-২০

১০. ঐ

১১. ঐ

১২. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১-৩১২

১৩. ঐ

১৪. ঐ

১৫. দূর্গাচন্দ্র সান্যাল, *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস*, কলকাতা, ১বৈশাখ ১৪১০, পৃ. ৫২-৫৪

১৬. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্য- ভাগবত*, পৃ. ৮, ৮২ আদিখন্ড, পৃ.২০৫ (মধ্য) এবং ৩১৬ ও৩৫০ ; সুখময় মখ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৫

১৭. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্য ভাগবত*, আন্ত, ৪র্থ, পৃ. ৩৫০

১৮. বিজয় গুপ্ত, *মনসা মঙ্গল*,বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ৩য় সংস্করন, পৃ. ০৪

১৯. এ.কে.এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১১১

২০. Md. Akhtaruzzaman, *Society And Urbanization In Meieval Bengal,* ASB, 2009, pp. 260-262

২১. এ. কে .এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৬৩-৬৫

২২. গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, ঢাকা ,২০০৫, পৃ. ৫৬

২৩. শেখ মোহাম্মদ ইকরাম, *পাকিস্থানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার,* ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৯৭

২৪. S.H.M. Rijvi. Shibani Ray, *Muslim Bio-cultural prospective,* Delhi,1984. pp. 42- 43.

২৫. K.M Ashraf, *Life and Condition of the people of Hinustan*, Delhi, 1959, p. 145

২৬. Charles Stewart, *History of Bengal*, Calcutta. 1910,p. 371

২৭. Md. Akhtaruzzaman, *op.cit*, pp. 173

২৮. Ibid

২৯. Ibid

৩০. Ibid

৩১. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal.* Vol.1.(1203-1357) Karachi, 1963. p.141

৩২. Jagadish Narayan Sarker, *Islam in Bengal,* Calcutta, 1972, p. 24

৩৩. মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৬২

৩৪. খান সাহেব আবিদ আলী খান, *গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় স্মৃতি*, চৌধুরী শামছুর রহমান সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৬

৩৫. Shamsuddin Ahmed, *Inscription of Bengal,* vol.iv, pp. 47-48

৩৬. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, সুলতানী আমল, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৪০

৩৭. গোলাম হোসেন সলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

৩৮. Shamsuddin Ahmed, *op.cit,* p.123

৩৯. Ibid

৪০. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৬

৪১. গোলাম হোসেন সলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

৪২. Muhammad Abdul Qadir, "The Newly Discovered Madrasha.Ruins of Gaur and Its Inscription", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, vol. xxiv-vi, 1979, p. 81

৪৩. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২

৪৪. J N Sarkar, *India Through the Ages*, Calcutta, 1979, p. 52

৪৫. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গ ভাষাও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৩-৭৫

৪৬. Muhamma Mohar Ali, *History of The Muslims of Bengal,*Riyadh,1985, pp. 854-874

৪৭. Ibid

৪৮. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

৪৯. ঐ , পৃ. ১৭৯

৫০. ঐ

৫১. ঐ, পৃ. ২৭৫

৫২. Md. Akhtaruzzaman, *op.cit*, pp. 165-169

৫৩. ঐ, পৃ. ৩১২

৫৪. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৯৪-৯৫

৫৫. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৩২০

৫৬. শাহ মুহাম্মদ সগীর, *ইউসুফ জুলেখা*, পৃ. ১২৩, ১৭৭,২০২, ২০৬,২২৫, ২৩৬ ;*Visva Bharati Annals*, vol.1, pp.1945, 114,119,123,125,132

৫৭. Md. Akhtaruzzaman, *op.cit*, pp. 296-299

৫৮. Ibid

৫৯. Ibid

৬০. Ibid

৬১. Ibid

৬২. *Visva Bharati Annals*, vol.1, 1945, pp. 119,122,125, 131

৬৩. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

৬৪. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭

৬৫. ঐ , পৃ. ২৫০

৬৬. সুভাষ মুখোপাধ্যায় , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

৬৭. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪

৬৮. ঐ, পৃ. ২৫৫

৬৯. Duarte Barbosa, *The Book of Duarte Barbosa,* (eng.tr, by.) M.L Dames, Delhi, 1989, p.180

৭০. Ibid

৭১. Ibid

৭২. *Visva Bharati Annals*, op.cit, vol.1, pp.1945, 117,122,131

৭৩. শাহ মুহাম্মদ সগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৩

৭৪. A B M Samsuddin Ahmed, *op,cit*, p. 299

৭৫. *Visva Bharati Annals*, vol.1, 1945, pp. 122,132; শাহ মুহাম্মদ সগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭,৩৪, ৩৭,১০০-১০১,১২৩,১৬০,১৬১,২১৭,২৩২

৭৬. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭, পৃ. ৯১

৭৭. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬

৭৮. *Visva Bharati Annals*, vol.1, 1945, pp. 122,124,132

৭৯. Ibid, pp.118,125; শাহ মুহাম্মদ সগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০, ১৫৯, ২৩১-২৩২

৮০. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৭

৮১. ঐ, পৃ. ১৪৩

৮২. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৬

৮৩. আব্দুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫৯-২৬০

৮৪. ঐ, পৃ. ১৪৩

৮৫. Abul Fadl, *op.cit*, p.136

৮৬. মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩

৮৭. ঐ

৮৮. ঐ

৮৯. অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস*, "সুলতানী যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা",কলকাতা, ২০০৫, পৃ.৩৬৮-৩৮০

৯০. ঐ

৯১. ঐ

৯২. ঐ

৯৩. Md. Akhtaruzzaman, *op.cit*, pp. 288-289; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১০

উপসংহার

প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। হিন্দু শাসনামলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও নগরায়ন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন বাংলার শীর্ষস্থানীয় হিন্দুরা (ব্রাহ্মণরা) অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল থাকলেও নীচু শ্রেণীর হিন্দুরা তাদের অর্থনৈতিক অবনতি, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে বৈষম্যের শিকার হতো। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে নিচু শ্রেণীর হাঁড়িতে ভাত ছিল না, পরনে ছেড়া কাপড় ছিল, শিশুরা ক্ষুধার্ত থাকতো। তৎকালীন বাংলার গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। একান্ত গ্রাম-নির্ভর তথা কৃষি নির্ভর অর্থনীতির সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠেনি একক মানসম্পন্ন কোন মুদ্রাব্যবস্থা । সপ্তম শতক পর্যন্ত স্বর্ণমুদ্রা ও রোপ্যমুদ্রা প্রচলিত থাকলেও সেনামলে এসব মুদ্রা উধাও হয়ে যায়। এমনকি তখন তাম্র মুদ্রাও প্রচলিত ছিল না। মুদ্রা হিসেবে কড়ি প্রচলিত ছিল। মুদ্রার উপস্থিতি না থাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে বাণিজ্যিক পথগুলো স্থবির হয়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ফলে নগরগুলো তথা রামাবতী/ লক্ষণাবতী, ত্রিবেণী ও দেবকোট তাদের পুরনো ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নগর ও বন্দরগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পরিণত হয়।

সুলতানী বাংলায় পর্যায়ক্রমে মুসলিম অভিজাত শাসকবৃন্দ আগমন করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চল জয় করেন। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে তারা তৎকালীন বাংলাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছিলেন, প্রতিটি অংশকে

ইক্‌তা বলা হতো। এই ইক্‌তা প্রথাকে কেন্দ্র করে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে সুলতানী বাংলায় কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক লক্ষণাবতী আক্রমণ করে দিল্লীর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবং লক্ষণাবতী সালতানাতকে চারটি প্রদেশে (বিহার, সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও লখনৌতি) ভাগ করেন। পরবর্তীতে সুলতানী বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহ বাংলার সবগুলো অঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য সংহত করেন এবং নামকরণ করেন বাংলা।

মুসলমানদের আগমনের পর বাংলায় নগরায়নের ক্ষেত্রে এক নতুন ধারা সূচিত হয়। নতুন অভিজাত শাসকশ্রেণীর এবং বহিরাগত মুসলমান ও বণিক শ্রেণীর আগমণের পর বাংলায় বিভিন্ন ধরনের নগর কেন্দ্র গড়ে উঠে। সময়ের সাথে সাথে এগুলো জনবহুল নগরীতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে সাতগাঁ, সোনারগাঁ ও পাণ্ডুয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। এই নগরকেন্দ্রসমূহ শীঘ্রই প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সুফি-সাধকদের বসতি ও খানকাহ স্থাপন ছিল নগরায়নের অন্যতম নিয়ামক। প্রকৃতপক্ষে, বহিরাগতদের প্রতিটি স্থাপনাই সময়ের ব্যবধানে একটি করে নগর কেন্দ্রে পরিণত হয়। নগরায়নের এই ধারা বাংলার ঝিমিয়ে পড়া নগর কেন্দ্রসমূহকে পূনরুজ্জীবিত করে এবং প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরিয়ে দেয়। প্রশাসনিক সদরদপ্তর, দুর্গ, খানকাহ ও মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপন করার ফলে বাংলায় বিভিন্ন নগর ও বন্দর গড়ে উঠে। এছাড়া মুসলিম শাসকরা নতুন শহর বা নগরের দরজা কারিগর, শিল্পীসহ সকল পেশাজীবি তথা ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু সকল সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য খোলা রাখতেন। ফলে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে যা ছিল নগরায়ন প্রক্রিয়ার একটি প্রধান কারণ। অন্যদিকে বিভিন্ন ধরণের নগর বন্দর উত্থানের সাথে সাথে টাকশাল নগরীরও উত্থান হয় এবং ধাতব (স্বর্ণ ও রৌপ্য) মুদ্রার প্রচলন হয়।

সুলতানী আমলের নগরায়নের ফলে বাংলায় মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে। সুলতানগণ বাংলায় কড়ির পরিবর্তে একক মানসম্পন্ন ধাতব মুদ্রার প্রচলন করেন যা ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। শাসকগণ সাধারণত কেন্দ্রিয় শহরগুলোর নিয়মিত দাপ্তরিক টাকশাল ও সাময়িক টাকশাল থেকে এসব মুদ্রা মুদ্রণ করতেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় প্রকার মুদ্রা ছিল বাংলার নগরায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাব। এ সময়ে ব্যাপকভাবে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন দেখা দেয় ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে বেশ কিছু শহর ও বন্দরের বিকাশ ঘটে যা অভ্যন্তরীণ ও বহি:বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মুসলিম আমলে স্বর্ণও রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার এত ব্যাপক ছিল যে, সাধারণ প্রজারা পর্যন্ত এ সময় মুদ্রায় খাজনা দিত। তাছাড়া বাংলার সুলতানরা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করে শুধুমাত্র অন্যান্য মুসলিম শাসকদেরকেই প্রলুব্ধ করেনি বরং বিশ্বের অন্যান্য অংশের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিল। একদিকে মুদ্রার প্রচলন, অন্যদিকে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পণ্যের উৎপাদন আন্ত র্জাতিক বাণিজ্যকে ত্বরান্বিত তথা বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যকে চাঙ্গা করেছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে লেনদেন বেড়ে যায়। ফলে বাংলা কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। মূলত মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি সমগ্র সুলতানী আমলে বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছিল। সুলতানী শাসনে বাংলায় যে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে তাকে বাংলার মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হয়। যদিও দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তৎকালীন বাংলার বাণিজ্যিক কার্যক্রম প্রায়ই থমকে দাঁড়িয়েছিল। কারন এ সময় মানসম্পন্ন একক মুদ্রা ব্যবস্থা অনুপস্থিত ছিল, নগরকেন্দ্র সংখ্যায় কমে গিয়েছিল, সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও অসমৃদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান

চালু ছিল। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে নতুন অভিজাতশ্রেণীর শাসকদের আগমনের ফলে দ্রুত নগরায়ন প্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক গতিশীলতা, বিভিন্ন ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা, নতুন নতুন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তথা সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করায় বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হয়। নতুন অভিজাত শাসকবৃন্দের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বহিরাগতদের সামাজিক রীতিনীতি, খাদ্যাভাস ও কতিপয় নির্দিষ্ট দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারনে ব্যবসায়-বাণিজ্য পূনরুজ্জীবন ঘটে ও বহি:বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। বাংলায় মুসলিম বহিরাগতদের আগমন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি সাধন করে। নতুন শাসকশ্রেণী ও মুসলিম অভিবাসীদের নবাগত চাহিদা পূরণের জন্য জনসাধারণ বাজারে নির্দিষ্ট দ্রব্যাদির দোকান গড়ে তোলে এবং বাংলার ব্যবসায়ীরা তুর্কীদের কাছে কর্পুর, জাফরান/কুমকুম, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, রেশম, জুতা (Paijjalla or, pai-i-jan) এবং মোজা প্রভৃতি বিক্রি করতো যা নি:সন্দেহে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল।

সুলতানী শাসনামলে বাংলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ তথা নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছিল। ফলশ্রুতিতে সমাজ ও অর্থনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয় যেমন, সকিয়া (জলচক্র), চাকা, রোলার, চাপযন্ত্র, জিপসাম মর্টার প্রভৃতি। এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যায়। সুলতানী আমলেই প্রথম বস্ত্রশিল্পে পণ্য (তুলা থেকে মোটা সুতা তৈরী) উৎপাদনের জন্য 'চরকা'র ব্যবহার করা হয়। ফলে পণ্যের উৎপাদন ক্ষমতা ছয় সাতগুন বেড়ে যায়। এছাড়াও অন্যান্য প্রযুক্তির মধ্যে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ে মধ্যযুগীয় যন্ত্র (astrolabe) ও

কম্পাস (sangi magmutis) উল্লেখযোগ্য ছিল। তৎকালীন সময়ে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে রেশম চাষ ও কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এ সময়ে স্থাপত্যে নানা রং ও নানা আকৃতির মিনা করা কাঁচের ন্যায় মসৃণ টাইল্‌স্ এবং নক্‌শা করা পোড়া মাটির টালি ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নতির জন্য নতুন শিল্পকারখানা গড়ে উঠায় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে গ্রাম থেকে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ ও শিল্পীরা নতুনভাবে সক্রিয় হওয়া নগর বা বন্দরে আসতে শুরু করে যার ফলশ্রুতিতে একটি সামাজিক গতিশীলতা দেয়া দেয় এবং বাংলার অনগ্রসর মুসলিম ও অমুসলিমদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়।

মুসলিম বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রে তথা সমাজ গঠন, সামাজিক স্তর বিন্যাস, সামাজিক গতিশীলতা বা বিবর্তন ও বিভিন্ন পেশার পরিবর্তনে নগরায়নের কতিপয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তৎকালীন সময়ের শাসকবৃন্দ, উলামা ও সুফি সাধকদের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে দ্রুত মুসলিম সমাজ গঠিত হয়। এছাড়াও সমাজ গঠনের কতিপয় নিয়ামক হলো- বহিরাগত মুসলমান ও বণিকশ্রেণীর আগমন, স্থানীয়ভাবে জন্মগ্রহণ, নিম্নশ্রেণীর অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ প্রভৃতি। উলামা, সুফি এবং মাশায়িখগণের অনাড়ম্বর জীবন-যাপন, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, ধর্ম ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের গভীরতা প্রভৃতি বাংলার অধিবাসীদেরকে তাদের দিকে আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এছাড়াও তাদের মানবিক কার্যকলাপ যেমন, লঙ্গরখানা তৈরী, খানকাহ, সরাইখানা এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনসাধারণের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সুলতানী আমলে বিভিন্ন সময় বাংলায় বহিরাগতদের আগমণের ফলে মুসলিম জনশক্তির ভিত্তি গড়ে উঠলেও উপরোল্লেখিত প্রভাবসমূহের জন্য তৎকালীন বাংলার নীচু শ্রেণীর (হিন্দু, বৌদ্ধ) লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ফলে মুসলমানদের

সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে অমুসলিমদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানো হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মুসলিম শাসন অর্থাৎ তুর্কি-আফগান যুগে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়ঃ যেমন, অভিজাত বা উচ্চ শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণী। অভিজাতদের মধ্যে আবার তিনটি স্তর বিদ্যমান ছিল। সৈয়দ, উলামা ও পীর দরবেশগণ ছিলেন প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল খান, মালিক, ওমরাহগণ। অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তৎকালীন সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত ছিল পেশাজীবি তথা চিকিৎসক, কবি, সংগীত শিল্পী, ধর্ম প্রচারকদের নিয়ে। শিল্পী, কারিগর, স্থপতি ও উৎপাদনকারী ব্যক্তিরাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্ষুদে কারিগর, উৎপাদক এবং শ্রমিকরা সমাজের সাধারণ অধিবাসী হিসেবে পরিগণিত হতো। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুরা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থান লাভ করেছিল। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে সুলতানের পরেই ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়। হিন্দু শাসনামলের অভিজাত সম্প্রদায় বংশগত মর্যাদার ভিত্তিতে নির্বাচিত হতো। হিন্দু শাসনামলের বিপরীতে মুসলিম শাসনের একটি বিশেষ পার্থক্য হলো অভিজাত সম্প্রদায় এ যুগে বংশগত ছিল না। এখানে বংশগত মর্যাদার চেয়ে ব্যক্তি প্রতিভাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো। মুসলিম শাসনামলে অনেক অমুসলিমগণ অভিজাত শ্রেণীতে নিয়োগ পেয়েছিল এবং বেশির ভাগ অভিজাত ব্যক্তিগণ নিজের যোগ্যতায় আমির-ওমরাহ্ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলো। ইবনে বখতিয়ার খলজি ও তাঁর সভাসদদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে শাসনকর্তার পদমর্যাদা লাভ করেছিল। মূলত মুসলমান

শাসকগণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর গুণী ও যোগ্য ব্যাক্তিদের জন্য সকল ক্ষেত্রে সমান সুবিধা দিয়েছিলেন।

মুসলমানদের আগমনে হিন্দু সমাজে সংস্কার আন্দোলন ও নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় মুসলমানদের উচ্চতর আদর্শসমূহ হিন্দু সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং এর ফলে হিন্দুদের বর্ণপ্রথা-পীড়িত সামাজিক জীবনে সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একাধিপত্যের সুযোগ-সুবিধা হারিয়ে ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করেছিল। ব্রাহ্মণগণ তাদের পেশার ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তারা গ্রামের বা শহরের বিভিন্ন মহল্লায় বসবাস করত। তাছাড়া ব্রাহ্মণরা ঘটকালি, চিকিৎসা ও অন্যান্য কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। তারা স্বার্থের লোভে অসাধুতা ও মিথ্যার আশ্রয় নিত। শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মুসলিম আমলে মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেছিল। ফলে শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং বিপুল উন্নতি সাধিত হয়।

তৎকালীন বাংলায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গতিশীলতা পরিলক্ষিত হয় ; এ গতিশীলতার নিয়ামকসমূহ হল- দ্রুত নগরায়ন প্রক্রিয়া, নগর-বন্দরসমূহের পুনরুজ্জীবন, নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভব, কুটির শিল্পের পরিবর্তে বৃহৎ আকারে শিল্পকারখানা গঠন প্রভৃতি। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রাম থেকে বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষ ও শিল্পীরা নতুনভাবে সক্রিয় হওয়া নগর বা বন্দরে আসতে শুরু করে এবং প্রচলিত নিয়মে শিল্পী কারিগরদের সমাজে নতুন নতুন জাতি (caste) ও শাখাজাতির (sub-caste)

জন্ম নেয়। ফলে বাংলার অনগ্রসর মুসলিম ও অমুসলিমদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নতি সাধিত হয়।

মুসলিম বাংলার প্রাথমিক দিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ বন্ধুত্বসুলভ পরিবেশে একক সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থায় বসবাস করত। সেখানে সকল ধরনের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া হতো। অভিজাত শাসকশ্রেণী ও আঞ্চলিক অমুসলিমদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে কতিপয় সমন্বিত রীতিনীতির উদ্ভব হয়। যেমন, মাজার ও দর্গায় গভীর শ্রদ্ধা জানানো, খাদ্যাভাস (ভাত, মাছ, মাংস), শাড়ি, লুঙ্গি ও ধুতি পরিধান করা ইত্যাদি। মুসলিম বাংলার সুফি-সাধক ও পন্ডিতগণের সরাসরি অংশগ্রহণে তৎকালীন বাংলায় সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া আরো উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হয়। এক্ষেত্রে সুফি-সাধকদের খানকাহ ও মাদ্রাসাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

সুলতানী আমলের নগরায়ন বাংলার সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন সাধন করেছিল। সাধারণ জনগণের খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকারাদি ও শিক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে সুলতানী বাংলার নগরায়নের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের কারনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-বাংলার দ্রুত নগরায়ন প্রক্রিয়া, শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক গতিশীলতা এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থা।

মুসলমান শাসনামলে বাঙালীর খাদ্যদ্রব্যে বিলাসিতার ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। সুলতানদের ব্যাপক নগরায়ন প্রক্রিয়ার ছোঁয়া বাঙালীর খাদ্যাভাসের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুসলমানগণ তাদের খাবারে ভাত, রুটি, বিভিন্ন রকম

মাংস (গরু, খাসি, হাঁস) এবং রোস্ট করা মাংস (roasted meat) পরিবেশন করত। সুলতানগণ তাদের খাবারে 'ঝলসানো ও রোস্ট করা গরু ও খাসির মাংস, গোলাপজল, বিভিন্ন সুগন্ধিযুক্ত সরবত ও শুকনো ফলমূল, মাংসের রেজালা, পানীয়, নান-ই-তামুরি, কেক, ঘি ও মুরগীর মাংস দ্বারা রান্না পোলাও, ভারতীয় কাচ্চি বিরিয়ানি ও পান-সুপারী প্রভৃতি পরিবেশন করতেন। অন্যান্য খাবারের মধ্যে সমুচা, রোস্ট করা ছাগল ছানা, ছাগলের মাথা ও জিহ্বা, ভেড়ার পায়ের ফ্রাই (ভাজা), দুম্বার লেজ, বিভিন্ন ধরনের পাখি ও মুরগী এবং মাখন উল্লেখযোগ্য। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি খাদ্য তালিকায় থাকতো যেমন, হালুয়া ও সাবুনি ইত্যাদি।

তৎকালীন সময়ের মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদে আভিজাত্যের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে সাধারণ স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত নানা রকমের শাড়ি বা ঘাগরা এবং চেলী পরিধান করতো। তারা বহু রুপার গহনা তাদের গলায় ও বাহুতে পরিধান করতো। এছাড়া পায়ে রুপা, তামার এবং হাতির দাঁতের আংটি ব্যবহার করতো। উচ্চবিত্ত মহিলারা সোনা, হীরা, মুক্তা, মরকত, চুনি ও রত্নখচিত ঘুঙুর পরিধান করত। সকল শ্রেণীর মহিলারা মাথায় সিঁদুর ও টায়রা পড়ত এবং নাকে নথ পড়ত। তাছাড়া সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা গলায় হার ও নখে আংটি পড়ত। অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিচ্ছদ পরতেন। তারা কামিজ (শার্ট) ও সালোয়ার (পাজামা) বা স্কার্ট পরিধান করতেন।

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় ফার্সি ছিল রাজ ভাষা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষাও ছিল ফার্সি। হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজসরকারে চাকুরি পাওয়ার আশা করতেন এবং চাকুরির প্রয়োজনে এ শ্রেণীর হিন্দুরা ফার্সি শিখতেন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও ফার্সি শিক্ষা দিতেন। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক

পর্যায় থেকে উচ্চশ্রেণীর বহু সংখ্যক হিন্দুকে মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে দেখা যেতো । রাজস্ব বিভাগের প্রায় কাজই কায়স্থদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এসব হিন্দুদেরকে অবশ্যই ফার্সি ভাষা শিখতে হতো; অন্যথায় তাদের রাজসরকারের চাকুরীতে নিয়োগ পাওয়া সম্ভব ছিল না।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম শাসনামল বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির গঠনমূলক যুগ। এ সময় বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ও শিল্পের প্রসারের ফলে নগরসমূহের সমৃদ্ধি সাধিত হয়। যার প্রভাব পড়ে তৎকালীন বাংলার নাগরিক জীবন তথা ধর্ম, ভাষা, স্থাপত্য বিদ্যা, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, খাদ্যসামগ্রী, কৃষির উন্নতি, উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উপর। তৎকালীন বাংলার সার্বিক উন্নতি পরবর্তী শাসকদের নিকট অতি মূল্যবান ঐতিহ্যরূপে পরিগণিত হয়। অমুসলিম যুগের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিক রাজনৈতিক সচেতনতা, মুসলিম ও অমুসলিমদের সম্প্রীতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা এবং সমন্বিত সামাজিক রীতি-নীতি ও সমাজের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জন তৎকালীন মুসলিম বাংলার নগরায়নের প্রতিফলন হিসেবে স্বীকার্য।

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থাবলি

ক. ১.প্রাথমিক উৎস

Afif, Shams-i-Siraj, *Tarikh-i -Firuz Shahi*, ed.by, Maulavi Vilayat Husain, Calcutta, 1891

Al-Juzzani, Minhaj-i-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, (eng.tr.) M.H.G. Raverty, 2 vols., London, 1881. *তবকাত-ই-নাসিরী*, (বঙ্গানুবাদ) আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮৩

Abul Fazl, Allami, *Ain-i-Akbari*, (eng. Tr.) H.S. Jarrett, Calcutta, 1949. *আইন -ই-আকবরী*, (বঙ্গানুবাদ) আহমেদ ফজলুর রহমান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩

—*Akbar Nama*, (eng.tr.) H. Beveridge, Calcutta, 1921

Barani, Ziauddin, *Tarikh-i-Firuz Shahi,* (eng. tr.) H.M. Elliot the History of India as told by its Own Historians, vol.III, London, 1871, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, (বঙ্গানুবাদ) গোলাম সামদানী কোরায়শী অনুদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২

Battuta, Ibn, *The Rehla of Ibn Battuta*, (eng.tr.) Agha Mahdi Hussain, Baroda, 1976, *Travels of Ibn Battuta,* 3 vols, (eng.tr) H.A.R Gibb, Hakluyt Society, Cambridge, 1971.

Barbosa, Durate, *The Book of Duarte Barbosa*, (eng. tr.) Mansel Longworth Dames, London, 1921.

—*A Description of the Coasts of East Africa and Malabar*, (eng.tr.) E.J.Stanley, Hakluyt Society, 1918.

Bernier, Francois, *Travels in the Mogul Empire,* (eng. tr.) Francois & Constable, S.chand & and co, New Delhi, 1972.

Mahuan, *Ying-yai-Sheng-Lan*: The Overall Survey of The Ocean's Shores, (1433); tran. and ed. by J.V.G. Mills, London, 1970, '*Kingdom of Bengal*' (eng. tran.) Georage Phillip, J.R.A.S., 1895. Mahuan Account together with other Chinese accounts about Muslim

Bengal. (eng. tr.) by Probodh Chandra Bagchi in *Visva-Bharati Annals,* 1945. pt.1.

Salim, Ghulam Husain, *Riyaz-s-Salatin*, (eng. tr.) by Maulvi Abdus Salam, Calcutta, 1902. tr. into Bengali by Akbaruddin, Dacca, 1974. *রিয়াজুস সালাতীন*, (বঙ্গানুবাদ) শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, ঢাকা , ২০০৫

Nathan, Mirza, *Bahristan-i-Ghaibi,* (eng.tr.) M.I. Borah, Gauhati, 1936. *বাহারীস্তান-ই-গায়েবী*, (বঙ্গানুবাদ) খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত, ঢাকা, ২০০৪

Pires,Tome, *The Suma Oriental of Tome Pires*, (eng. tr.) Armando Cortesao, vol.I, London, 1944

ক.২ মুদ্রা ও শিলালিপি সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি

Bhattasali, Nalini. Kanta, *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal,* Cambridge, 1922

Ahmad, Shamsuddin, *Inscriptions of Bengal*, vol.IV, Rajshahi, 1960

Dani, Ahmad Hasan, *Bibliography of the Muslim Inscription of Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1957

Karim, Abdul, *Corpus of the Muslim Coins of Bengal* (Down to A.D.1538), Asiatic Society of Pakistan Publication No.6, Dhaka

—*Catalogue of Coins in the Cabinet of the Chittagong University Museum,* Chittagong,1979

—*Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal,* Asiatic Society of Banladesh, 1990

Majumdar, Nani Gopal, *Inscriptions of Bengal,*vol. III Varendra Research Society, Rajshahi,1929

Sen, B.C., *History Aspects of Bengal Inscription*, Calcutta University, 1940

Thomas, Edward, *The Chronicles of the Pathan Kings of* Delhi, Delhi, 1967

Dhaka University Institutional Repository

ক.৩ সাহিত্যিক গ্রন্থাবলি

গুপ্ত, বিজয়, *মনসা মঙ্গল*, বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, বাণীনিকেতন (প্রকাশনার তারিখ নেই)

চন্ডীদাস, *শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন*, বসন্ত রঞ্জন রায় কর্তৃক সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কোলকাতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

দাস, বৃন্দাবন, *শ্রী চৈতন্য ভগবত*, চতুর্থ সংস্করণ, মৃণাল কান্তি ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, কোলকাতা, ৪৪০ গৌরাঙ্গাব্দ

বাহরাম খান, দৌলত উজির, *লাইলী মজনু* (আহমদ শরীফ সম্পাদিত) ঢাকা, ১৯৫৭

বিপ্রদাস, *মনসা বিজয়*, সুকুমার সেন কর্তৃক সম্পাদিত, কোলকাতা, ১৯৫৩

সগীর, শাহ মুহাম্মদ, *ইউসুফ জুলেখা*, মোহাম্মদ এনামুল হক কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪

খ. দ্বৈতীয়িক উৎস

Akhtaruzzaman, Md, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, 2009

Ashraf, K.M, *Life and conditions of the people of Hindustan,* (1200-1550A.D), Delhi, 1959

Abid Ali Khan, *Memoirs of Gaur and Pandua*, ed. by H.E.Stapleton, Calcutta, 1931

Boxer, C.R, *The Portuguese Sea-borne Empire*, 1415-1825, London , 1969

Bharadwaj, R.k, *Urban Development in India*, Delhi, 1974

Cunningham, Alexander, *Archaeological Survey of India Report*, vol. xv, Calcutta, 1882

Chakrobarti, Dilip K, *The Archaeology of Indian Cities*, New Delhi, 1998

— *Ancient Bangladesh,* A study of the Archaeological Sources, New Delhi, Oxford University Press, 1992

Choudhury, Tapan Ray & Habib, Irfan (ed.), *The Cambridge Economic History of India,* 1200-1750, vol.1, Cambridge, 1982

Dhaka University Institutional Repository

Eaton, Richard M., *The Rise of Islam and the Bengal Frontier* (1204-1760), Oxford University press, 1994

Habibullah, A.B.M, *The Foundation of Muslim Rule in India*, Allahabad, 1961

Husain, A.B.M, *Gawr–Lakhnawti*, Asiatic Society of Bangladesh, 1997

Hunter, W.W, *Report of the Education Commission,* Calcutta, 1883

Islam, Kamrunnesa, *Aspects of Economic History of Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1984

Jaffar, S.M, *Some Cultural Aspects of Muslim Rule in India*, Jayyed Press Delhi, 1972

Jaffar, S.M, *Education in Muslim India*, Delhi, 1972

Majumder, R.C, *History of Bengal*, Vol.1, D.U, 1943

Mohar, Ali Muhammad, *History of Muslims of Bengal,* Vol.1(B), Rayadih, 1985

Murtaza, Ali Sayed, *History of Chittagong*, Dhaka, 1964

Mukherjee, R.K, *A History of Indian Shipping*, Orient Longmans, 1957

Naqvi, Hameeda Khatoon, *Urbanization and Urban Centers Under the Great Mughals* (1556-1707) vol.1, Simla, 1972

— *Urban centres & Industries in Upper India.* Asia publishing House, Bombay, 1928

Roy, H, *Trade and Diplomacy in India, China Relation*, A study of Bengal During the Fifteenth Century, New Delhi, 1993

Rijvi, S.H.M. & Ray Shibani, *Muslim Bio-cultural Prospective*, Delhi, 1984

Rubbee, Khondkar Fuzli, *The Origin of the Musalmans of Bengal,* Calcutta, 1895

Rahim, Muhammad Abdur, *Social and Cultural History of Bengal*, vol.1, (1203-1576), Karachi, 1963

Sarker, Jagadish Narayan, *Islam in Bengal,* Calcutta, 1972

Stewart, Charles, *History of Bengal*, Calcutta, 1910

Sarkar, Jadu-nath, *The History of Bengal,* Vol.2, Muslim Period (1200-1757), D U, Dacca , 1972

- *India Through the Ages*, Disha Books, Calcutta, 1979

Tarafdar, Momtazur Rahman, *Husain Shahi Dynasty in Bengal*, Dhaka, 1965

—*Husain Shahi Bengal*, 1494-1538 A.D, A Socio-Political Study, Dhaka, 1999

The New Encyclopedia Britanica, Vol.11, 1975

Encyclopedia of Islam, London, 1960

খান, আবেদ আলী, *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

আবু মহামেদ *হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ১৯৯১

আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, ঢাকা, ২০০০

আশরাফ, কে.এম, *হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচর্চা*, কলকাতা, ১৯৯৪

ইকরাম, শেখ মোহাম্মদ, *পাকিস্থানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার*, ঢাকা, ১৯৯৬

করিম, মো: রেজাউল ও আসগর সৈকত, *সোনারগাঁয়ের উৎস ও উপাদান*, ঢাকা, ১৯৯৩

করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস*, সুলতানী আমল, ঢাকা, ১৯৯৯

চৌধুরী, আবদুল মমিন ও আলম ফকরুল, *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬

চক্রবর্তী, রজনীকান্ত, *গৌড়ের ইতিহাস*, মালদহ, ১৯০৯

চৌধুরী, আব্দুল হক, *বন্দর শহর চট্টগ্রাম*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪

—*চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, চট্টগ্রাম, ১৯৮২

জাকারিয়া, এ. কে. এম, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪

তরফদার, মমতাজুর রহমান, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা, ১৯৮১

—*হোসেনশাহী আমলে বাংলা* ১৪৯৪-১৫৩৮, একটি সামাজিক রাজনৈতিক পর্যেষণা, অনুবাদ মোকাদ্দেসুর রহমান, ঢাকা, ২০০১

ফারুক, আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮৩

বিশ্বকোষ, একবিংশ ভাগ, কলিকাতা, ১৩১৭ সাল

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বকোষ, দ্বাবিংশ ভাগ কলিকাতা, ১৩১৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র শাস্ত্রী (অনুদিত), *কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম* (কোটিল প্রণীত অর্থশাস্ত্র), কলকাতা, ২০০২

মোস্তাফিজুর, রহমান সুফি, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, (*বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*-১), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

হোসেন, এ. বি. এম, স্থাপত্য, (*বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*-২), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

ভট্টাচার্য, শ্রী নৃপেন্দ্র, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৬১

ভট্টশালী, নলিনীকান্ত, *বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম;* অনুবাদ, মোঃ রেজাউল করিম, ঢাকা, ১৯৯৭

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, মধ্যযুগ, কলিকাতা, ২০০৬

—*বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খন্ড (প্রাচীন যুগ), কলিকাতা, ১৯৮১

মন্ডল, সুশীলা, *বঙ্গদেশের ইতিহাস*, মধ্যযুগ; প্রথম পর্ব, ঢাকা, ২০০৪

মুখোপাধ্যায়, সুখময়, *বাংলার ইতিহাস* (বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব), ঢাকা, ২০০৫

—*বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর*, (স্বাধীন সুলতানদের আমল), কলিকাতা, ১৯৮০

মিত্র, সুধীর কুমার , *হুগলী জেলায় ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ*, কলিকাতা, ১৯৬৫

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, *বাঙালির ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯

মাইতি, শ্রী প্রভাতাংশু, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা* (দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস), কলকাতা, ১৯৯৯

শর্মা, রামশরণ, ভারতে নগর অবক্ষয়, কলকাতা, ১৯৯৯

স্যানাল, দুর্গাচন্দ্র, *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস*, কলকাতা, ১লা বৈশাখ ১৪১০

সেন, দীনেশ চন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কোলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ

সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, কলকাতা, ১৯৪০

হাবীব, ইরফান, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, (অনু. সৌভিক বন্দোপাধ্যায়), কলকাতা, ২০০৪

হক, মুহাম্মদ এনামুল , *বঙ্গে সুফী প্রভাব* , কলকাতা , ১৯৩৫

রায়, নীহার রঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, কলকাতা, ২০০১

রায়, অনিরুদ্ধ, *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস* (সুলতানী আমল), কলকাতা, ২০০৫

—*মধ্যযুগের ভারতীয় শহর*, কলকাতা, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

—*সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি সমীক্ষা*, কলকাতা, ১৯৯৭

রায়, আনন্দনাথ, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, কলিকাতা, বাংলা ১৩১৬

রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, ১৯৮২

ভারতকোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯৬৬

গ. পিএইচ.ডি থিসিস: (অপ্রকাশিত)

Habiba Khatun, *Sonargaon: Its History and Monuments* (1338-1608 AD), Dhaka University, 1987 (Published)

A B M Shamsuddin Ahmed, *Bengal Under the Rule of the Early Iliyas shahi Dynasty*, Dhaka University, 2001

Anil Kumar Das, *Urbanization in Mughal Bengal in the Seventeenth Century,* Jadavpur University, 1993

Md. Rezaul Karim, *A Critical Study of the Coins of the Independent Sultans of Bengal,* Dhaka University, 2001

ঘ. মানচিত্র:

Irfan Habib, *An Atlas of the Mughal Empire*, 1982

ঙ. প্রবন্ধাবলি

Ali Athar, "The Turkish Warfare during the 13th century", *History Seminar Series No. 3,* on 18th May, 1984, CAS in History, A.M.U., Aligar

Ali, Syed Murtaza, "Review on Social and Cultural History of Bengal, vol. 11(1576-1857) of Abdur Rahim, Karachi, 1967", *JASP,* vol. xiii, no. 1, 1968, pp. 1 18-123

—"Review on Muhamrriad Enamul Haq: A History of Sufism in Bengal, ASB, 1975," *JASB,* vol.xxii, No. I, pp. 90-94

Al-Masumi, M. Saghir Hasan, "Sunargaon's Contribution to Islamic Learning", *IC,* vol. xxvii, January, 1953, pp. 8-19

Dhaka University Institutional Repository

__"Sylhet - A Centre of Islamic Learning," *JASP,* vol.x, No, 11, 1965, pp. 63-67

Ansari, Hasan Nishat, "Bakhtiyar Khalji and the Principality of Tirhut", *JBRS,* vol.lv, pt. 1 -IV, Jan-Dec., 1969, pp. 128-132

Askari, Syed Hasan, "New Light on Raja Ganesh and Sultan Ibrahim Sharqi of Jaunpur from Contemporary Correspondence of two Muslim Saints", *BPP,* vol.xlvii, no. 130, 1948, pp. 32-39

__ "The Malfuzat and Maktubat of a Fourteenth Century Saint of Bihar", *JBRS,* vol. xxxiv, pt. III-IV, Sept, Dec., 1948, pp. 87-103

__ "A Fifteenth Century Shuttari Sufi Saint of North Bihar", *JBRS,* xxxvii, pt, 1-2, March-Jun, 1951, pp. 66-82

__"Hazrat Husam al-Din of Manikpur," reprint from *JPHS, PPHC,* 3rd session, Dhaka, 1953, pp. 1-12

Banerji, Ramesh Chandra, "The Vangalas," *Indian Culture,* vol.ii, no. 1, 1936, pp. 755-60

Binerjee, R.D, "Some Unpublished Records of the Sultans of Bengal", *JBORS,* vol. iv, 1918

Bangerji, S.K., "Iltutmish As Seen In the Monuments," *BPP,* vol. 55, 1938, pp. 125-131

Bashar, Khairul, "Muslim Contribution to Bengali Literature", *Islam in Bangladesh* (ed.) Rafiuddin Ahmed (Bangladesh Itihas Samity, Dhaka, 1983)

Bhattasali, N.K, "Bengal Chiefs struggle for Independence in the Reigns of Akbar and Jahangir, "*BPP,* vol. 35, Jan-Jun, 1928, pp. 25-39.

—"Antiquity of the Lower Ganges and its Courses," Science & Culture, vol. 7, No. 5. 1941, pp. 233-39

Chattopahyaya, B.D. "Urban Centres in Early Bengal", Archaeological Perspectives, *Pratna Samiksha* 2&3, (1993-94)

Dhaka University Institutional Repository

Buchanon Hamilton, "Dinajpur", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* 1833

Dani, Ahmad Hasan, "The House of Raja Ganesa of Bengal," *JASB* - (Letters), vol.18, no. 2, 1952, pp. 121-170

__"First Muslim Conquest of Lakhnor", *IHQ,* vol.xxx, 1954, pp.ll- 18

__ "Date of Bakhtiya's Raid on Nadiya," *IHQ,* vol.xxx, 1954.

__"The Bengal Muslim Society: It's Evolution", *Bengali Literary Review,* vol. 2, 1956, pp. 4-9

__"Shamsuddin Ilyas Shah, Shah-i- Banglah," Essays Presented to Sir Jadunath Sarkar" (ed.) H.R. Gupta, (Deptt. of History, Panjab University, 1958), pp .50-58

Hodivala, S.H, "Notes and Queries Regarding Mughal Mint Towns", *JASB,* (NS), vol. xvi, 1920

Habib, Irfan, "Economic History of the Delhi Sultanate", *The Indian Historical Review*, vol.v No.1, July, 1977

—"Economic History of the Delhi Sultanate", *The Indian Historical Review*, vol-v, July, Indian Council of Historical Research, 1977

Husain, Shahanara, "Life of Village Women in Early Medieval Bengal", JASB, vol. xix, no.2, pp. 1-9

Wise, James, "Notes on Sonargaon; Eastens Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol-XLIIL, 1974, Port-1, pp. 82-96

Akhtaruzzaman, Md, "Process of Urbanization in Early Muslim Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Hum. 46(1), June-2000

—"Richard M.Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1204-1760 AD)" (a review article) The Dhaka University Studies, vol.53, no.2, Dec.1997,

—"The Sultanat of Bengal and Its Political Culture" in Fakrul Alam & Firdous Azim (ed) *Politics and Culture* (Essays in Honour of

Dhaka University Institutional Repository

Serajul Islam Choudhury), University of Dhaka, Feb. 2002, pp.339-350

— "Socio-economic Relations between Medieval Bengal and Arakan" (in Bengali) *Itihas,* vol.35, 1405 BS, pp.11-20

—"Political Relations between Medieval Bengal and Arakan", *PIHC,* 61st millennium session, Kolkata, 2001, pt.ii, pp.1081-1092

—"Biography of Dhannasvamin as a Source of History" (in Bengali) the *Dhaka,* vol.69, Feb. 2001, pp.55-70.

— "A.B.M. Husain (ed) Gawr-Lakhnauti, ASB, Dhaka, 1997" (a. review article) *JASBD,* vol.45, no. 1, June, 2000, pp.97-100

—"The Muslim Rulers and Their non-Muslim Subjects in Thirteenth 'and Fourteenth Centuries Eastern India", *Essays in Memory of Professor M.R. Tarafdar* (ed.) Parveen Hasan & Mufakharul Islam, Centre for Advanced Studies in the Humanities, University of Dhaka, 1999, pp.132-148

— "Women in the Thirteenth Century Society of Eastern India", *The Dhaka University Studies,* vol.55, no.1, June, 1998, pp. 17-21

—"The Scope of Studying Social History of Bengal", *Perspective in Social Sciences (*a Journal of the Centre for Advanced Studies in the Social Sciences, University of Dhaka) vol.5, Oct. 1998, pp. 206-219

—"History of Sufism in Bengal: An Introduction", *Philosophy and Progress,* vol. xxviii, Dec.2000, pp.191-205

—"A.K.M. Shahnewaz, Society-Culture as Reflected in Coins and Inscriptions in Medieval Bengal: 1200-1538 AD" (in Bengali) (a review article) *Bangladesh Asiatic Society Patrika,* vol. 28, no.1, June, 2000, pp. 143-146

— "History of Early Muslim Eastern India: A Study of Some Perso-Arabic Sources", *JASBD,* vol.50, 2005, 247-257

Dhaka University Institutional Repository

Majumdar, Shri Bhupati, "Rivers in the Bengal Delta: River Problem in West Bengal and Their Solution", *JASB (*Science) vol. xviii, no. 2, June, 1940, pp. 219-278

Moni, De, "An Account of the Temple of Tribeni near Hooghly" *JASB*, vol. xvi, pt. 1, 1847, pp. 392-400

Marshal, Sir John, "The Monuments of Muslim India", *Cambridge History of India,* vol. iii (ed.) Sir Wolsely Haig (Chand & Co. Belhi, 1958)

Abdul Qadir, Muhammad, "The Newly Discovered Madrasha.Ruins of Gaur and its inscription", *Journal of Asiatic Society of Bangladesh*, vol- xxiv-vi, 1979-81

Jahan, M. Mir, "Mint Towns of Medival Bengal" Proceeding, of the *Pakistan Historical Conference*, Pakistan Historical Society, 1953

Rahim, M. Abdur, "Chittagong under the Pathan Rule in Bengal", *JASB,* Letter, vol. xviiim no. i, 1952, pp. 21-30

Rashid, A. "Agricultural Tracts, Pastures and Wood-Lands in Medieval India", *JBRS,* vol. liii, pts. i-iv, Jan-Dec, 1967, pp. 161-169

__"Industry and Industrial Workers in Medieval India", *JBRS,* vol. liv, pts. I-iv, Jan.-Dec., 1968

Rashid, Harun-ur, "The Geographical Background to the History and Archeology of South-East Bengal", *JASB* (Humanities) vol. xxiv-xxvi, 1979-1981, pp.159-178

Ray, Nihar Ranjan, "Medieval Bengali Culture (A Socio-Historical Interpretation) *The Visva Bharati Quarterly,* vol. xi, pt.i, (NS) May-July, 1945

Sharma, R.S., "Decay of Gangetic Towns in Gupta and Post-Gupta Times", *PICH,* 33rd Session, Muzaffarpur, 1972, pp. 92-104

Dhaka University Institutional Repository

Tarafdar, M. R., "Review on 'Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal (Down to A.D. 1538)' by Dr. Ahmad Hasan Dani, *JASP, 1951, "JASP,* vol. iii, 1958, pp. 206-231

__"Bengal's Relation with Her Neighbours: A Numismatic Stud", *Nalini Kanta Bhattasali Commemoration Volume* (ed.) A.B.M. Habibullah, (Dhaka Museum, 1966), pp. 227-256

__"Trade and Society in Early Medieval Bengal", *IHR,* vol.iv, Nos. 1-2, 1977-78, pp. 274-286

__Banglar Varna Babastha O Samaj Kathomo" (in Bengali), dh*aka Visva Vidaylay Patrika,*vol. xviii, Dec. 1983, pp. 185-213

__"Bengal Economy Viewed in the Light of Tome pires," Observations, *JASBD* (Humanities), vol. 40, No. 2, Dec. 1995, pp. 309-319

Babdyopadhaya, Rakhal Das, "Saptagram or Satgawn," *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, July 1909, pp.245-259

Ahmad, S. Maqbul, "Commercial Relations of India with the Arab world", *Islamic culture*(An English Quarterly), vol. XXXVIII, No.2, Islamic Cultural Board Hyderabad, 1964

আলী, আহমেদ, "ইবনে বতুতা বাংলাদেশকে যেমন দেখেছেন" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* সংখ্যা ৩৭, ১ নং, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০০

আলী, সৈয়দ মর্তুজা, হযরত শাহ জালাল ও শ্রীহট্টের ইতিহাস, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৯, পৃ, ৭৯-১২০

আহমেদ, গুলশান, "সোনারগাঁও পরিচিতি", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা* ৩য় বর্ষ- ৩য় সংখ্যা, ১৩৭৬

আহমেদ, ফকির ফারুক, "পানাম নগর, অতীত ও বর্তমান", *ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা*, অষ্টবিংশতিবর্ষ, ১৯৯৬

খাতুন, আশিয়ারা, "সুলতানী আমলে বাংলার নগর, প্রকৃতি ও প্রকারভেদ", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ত্রিশবর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৪০৩

Dhaka University Institutional Repository

খাতুন, হাবিবা, "সোনারগাঁও রাজধানী শহর ও বন্দর", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, একবিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা-১৩৯৪

ভাদুড়ী, রীনা, "মুসলিম শাসনের প্রারম্ভে ও সুলতানী আমলে বাংলার নগর বিন্যাস", *ইতিহাস অনুসন্ধান* (৩) কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৬

ভট্টাচার্য, বিশ্বেশ্বর, "ফতেয়াবাদ", *সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা*, সংখ্যা ৪০, ১৩৪০ বাংলা

শাহনাওয়াজ, এ.কে.এম, "প্রাথমিক সূত্রে সুলতানী বাংলায় নগরের ক্রমবিকাশ", *The Jahangir Nagar Review,* part-c,vol-xi&xii, 1990-2000& 2000-2001